মনীষী
আশুতোষ

মণীষী আশুতোষ

অমরনাথ রায়

অমর ভারতী
৮সি, ট্যামার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
অধীর পাল
অমর ভারতী
৮সি, ট্যামার লেন,
কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারী, ১৯৬৬

মূল্য : ৯.০০ টাকা

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রাকর :
অবনীকুমার দাস
লক্ষ্মীশ্রী মুদ্রণ শিল্প
৪৫, রামমোহন সরণী
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

বাংলার গৌরব কর্মযোগী আশুতোষের
পুণ্য জীবন কাহিনী
তাঁরই জন্ম-শতবার্ষিকীতে
স্নেহভরে তুলে দিলাম
বাংলার ছেলেমেয়েদের হাতে।
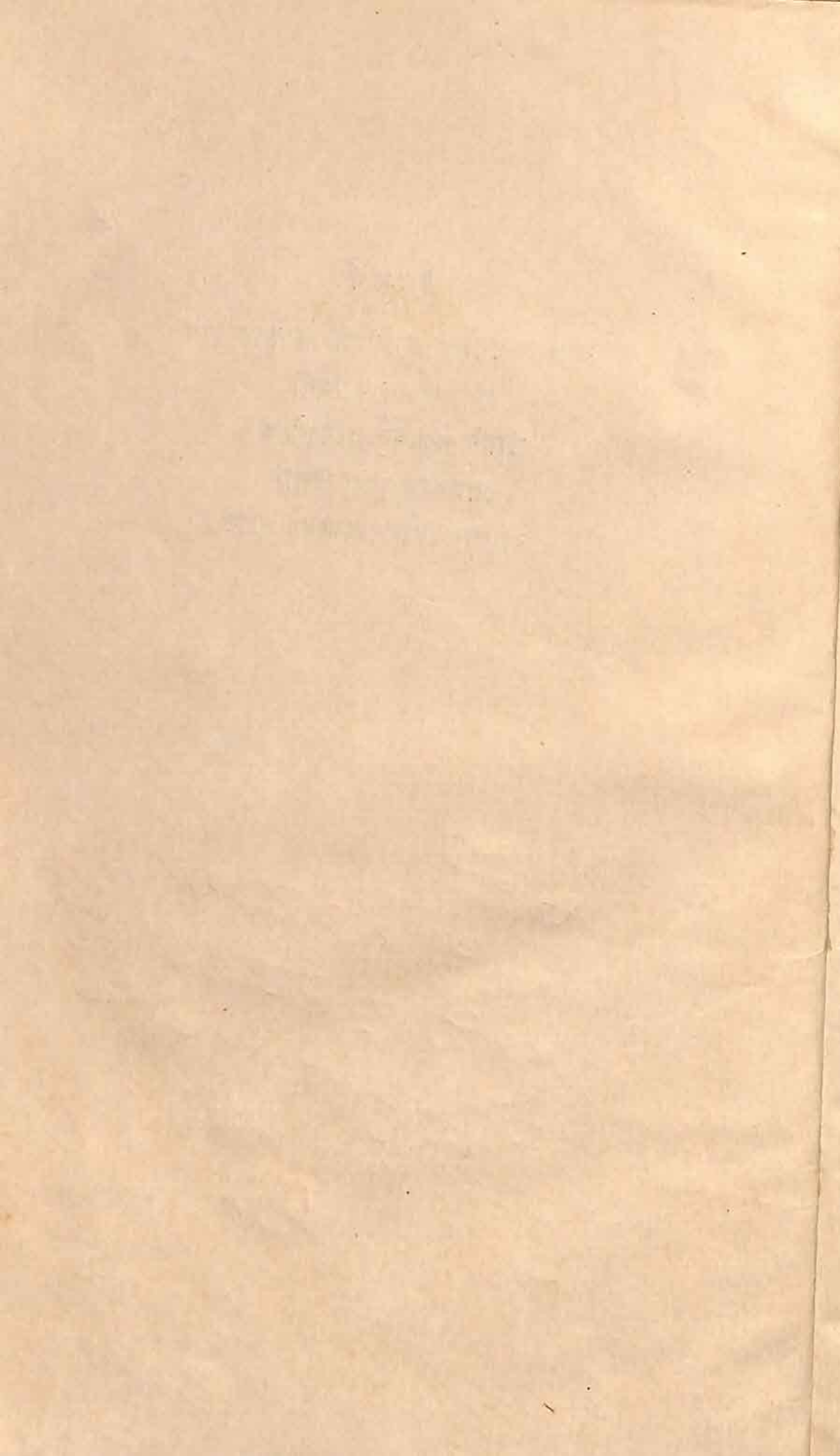
॥ নিবেদন ॥

আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে আমাদের এই বাংলা দেশের বুকে জন্মেছিলেন এক মনীষী। তিনি আর কেউ নন্, 'বাংলার বাঘ—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়'। বাংলা, তথা ভারতের শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রতিভাবান পুরুষ যে অক্ষয়-কীর্তি রেখে গেছেন তার তুলনা হয় না। তাই এই পুরুষ-সিংহের কর্মময় পুণ্য জীবনী আলোচনা করা, তাঁর আদর্শে বাংলার সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। আর সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর জন্ম শত-বার্ষিকীর পুণ্যতিথিতে এ গ্রন্থের প্রকাশ।

রায়বাড়ী,
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

—অমরনাথ রায়
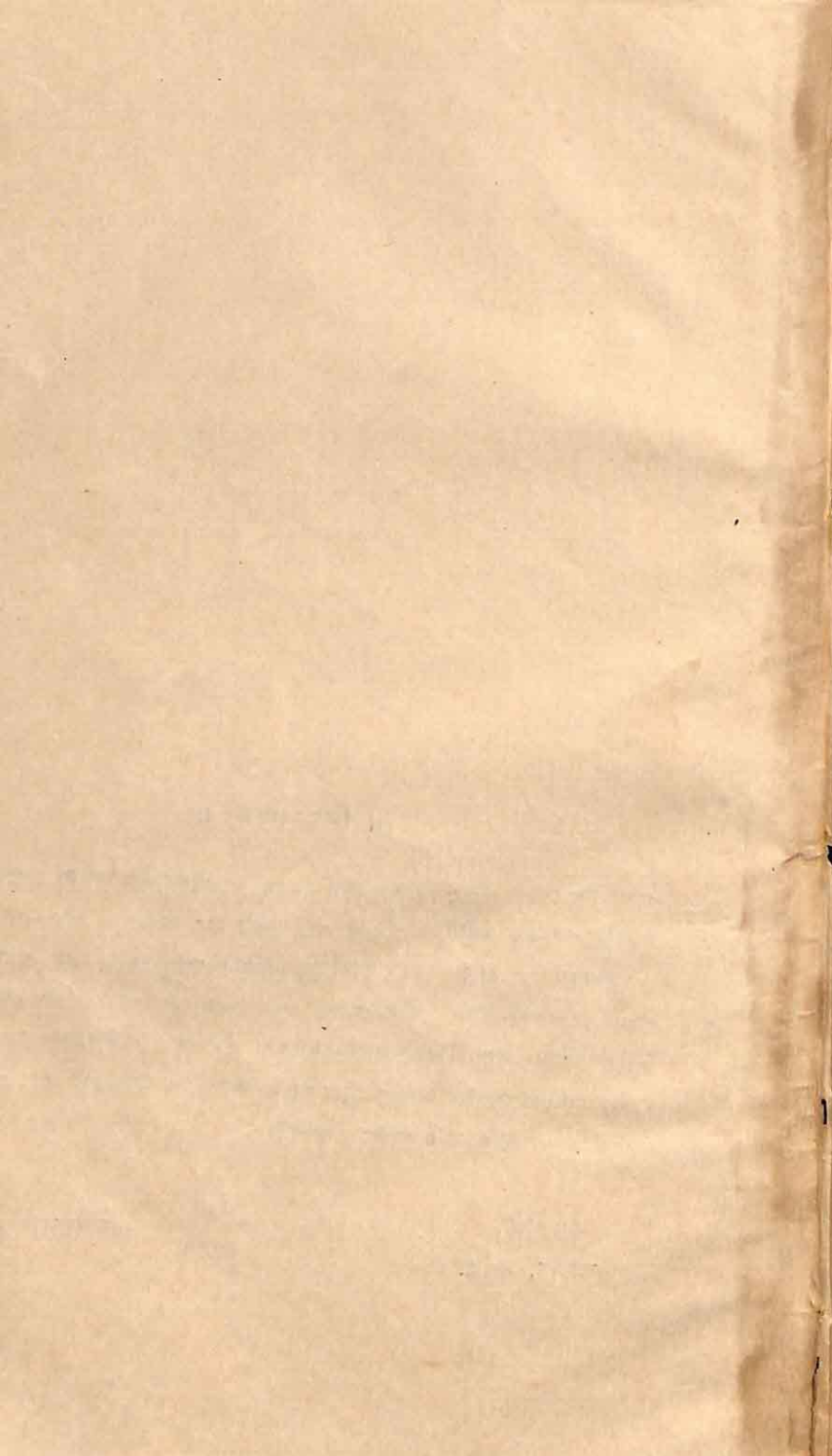
"যাহা কিছু নীচু, যাহা কিছু সংকীর্ণ, যাহা কিছু অসৎ, তাহা উরগ-ক্ষত অঙ্গুলীর ন্যায় পরিহার করিয়া, যাহা সুন্দর, নির্মল, নিষ্পাপ, মনোহর যাহাতে দানব মানব হয়, মানব দেবতা হয়, তাদৃশ সদ্ভাব-পুষ্প চয়ন করিতে হইবে এবং সেই সদ্ভাব কুসুমে আমাদের জননী বঙ্গবাণীকে অলংকৃতা করিতে হইবে।"

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বাংলার বাঘ

এক
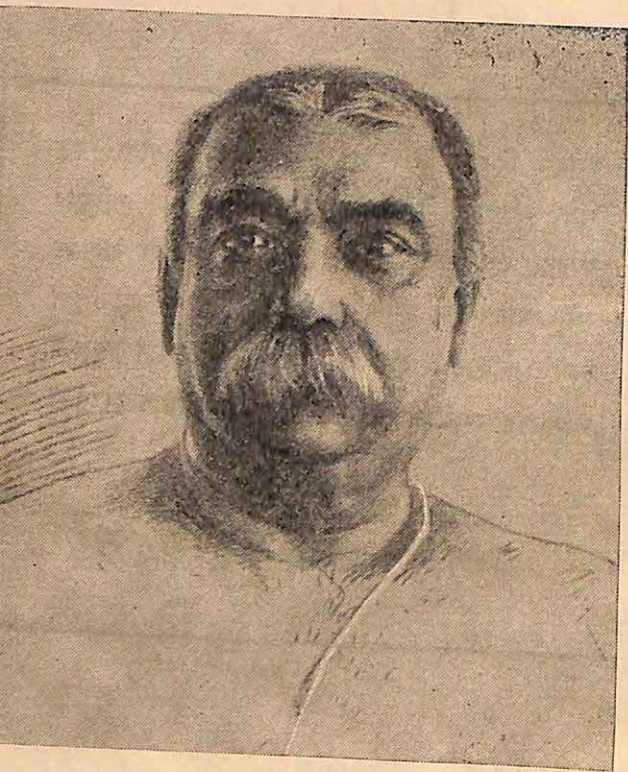
কবি কৃত্তিবাসের নাম নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছ।

কৃত্তিবাস ছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর মানুষ।

মহাকবি বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ক'রে কবি কৃত্তিবাস আজও অমর হয়ে আছেন। কৃত্তিবাসের বাস ছিল নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে।

কৃত্তিবাসের বৃদ্ধপ্রপিতামহ নৃসিংহ ওঝা ছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর মানুষ। মহারাজ দনুজমাধবের মন্ত্রী ছিলেন তিনি। তাঁর পৈত্রিক বাস ছিল 'সোনার গাঁ'।

শোনা যায় যে, সামসুদ্দিন ফিরোজ শা যখন বাংলাদেশ জয়ের আশায় মহারাজ দনুজমাধবের রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন নৃসিংহ ওঝা সোনার গাঁ ছেড়ে শান্তিপুরের কাছে গঙ্গার ধারে এক গ্রামে চলে আসেন। এই গ্রামে তখন বহু ফুলবাগান ছিল। সেইজন্যে গ্রামটির নাম হয়েছিল 'ফুলিয়া'।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে ঃ

পূর্বেতে আছিল যে দনুজ মহারাজা।
তার পাত্র ছিল নরসিংহ ওঝা ॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর ॥

নৃসিংহ ওঝার কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন রাম মুখোপাধ্যায়। রাম মুখোপাধ্যায় ফুলিয়ার যে অংশে বাস করতেন সেই অংশ ছোট ফুলিয়া নামে পরিচিত হয়। এই রাম মুখোপাধ্যায়ই হচ্ছেন মনীষী আশুতোষের আদি পুরুষ।

রাম মুখোপাধ্যায়ের বংশধর রামজয় মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলার 'জিরাট' গ্রামে বিয়ে করেন। বিয়ের অল্প কয়েক বছর বাদেই দু'বছরের শিশুপুত্রকে রেখে রামজয় মারা যান।

এই শিশুপুত্রের নাম বিশ্বনাথ। ইনি ছিলেন আশুতোষের পিতামহ। ইনি জিরাট গ্রামেই নিজের বসতবাটি নির্মাণ করেছিলেন। বিশ্বনাথের চার ছেলে। সেজ ছেলের নাম গঙ্গাপ্রসাদ। এই গঙ্গাপ্রসাদেরই সুযোগ্য পুত্র ছিলেন আশুতোষ।

গঙ্গাপ্রসাদ যখন চার কি পাঁচ বছরের শিশু, তখন তাঁর মা ব্রহ্মময়ী দেবী মারা যান। বিশ্বনাথের বাড়ীতে জাহ্নবী নামে এক কায়স্থ দাসী ছিল। অত্যন্ত স্নেহময়ী দাসী। সে-ই গঙ্গাপ্রসাদকে প্রতিপালন করে—মায়ের অভাব বুঝতে দেয় না শিশুকে।

গ্রামের পাঠশালার পাঠ শেষ ক'রে গঙ্গাপ্রসাদ আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন সেখানকার হেয়ার স্কুলে।

ওঁদের আর্থিক অবস্থা তখন ভাল ছিল না। বড় ভাই দুর্গাপ্রসাদ ছোট ভাই তিনটিকে খুব কষ্ট করে মানুষ করেছিলেন। রাত্রে প্রদীপ জ্বালাবার জন্যে রেড়ির তেল কিনবার পয়সাও অনেকদিন জুটতো না। তাই গঙ্গাপ্রসাদকে প্রায়ই রাস্তার লাইটপোষ্টের নীচে দাঁড়িয়ে পড়া মুখস্থ করতে হতো।

এখনকার যেমন স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা, তখন ছিল তেমনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফি ছিল দশ টাকা। ফি দাখিল করার শেষ দিন বড় ভাই দুর্গাপ্রসাদ বহু কষ্টে দশটি টাকা যোগাড় ক'রে গঙ্গাপ্রসাদের হাতে দেন। গঙ্গাপ্রসাদ তাড়াতাড়ি রওনা হন ফি জমা দিতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পথে পকেটমার ঐ টাকা চুরি ক'রে নেয়।

গঙ্গাপ্রসাদ তখন পৃথিবী অন্ধকার দেখেন। এতদিনের পরিশ্রম, এত আশা-ভরসা মাত্র দশটি টাকার জন্যে নষ্ট হতে চলেছে ! কিন্তু কি করবেন তিনি—কোথায় পাবেন ফি-এর টাকা ?

এক দরদী সাহেব অধ্যাপক তাঁকে ঐ টাকা দিয়ে শেষ মুহূর্তে শেষ রক্ষা করেছিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদ ১৮৫৭ সালে কলকাতার হেয়ার স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। তখনকার দিনে নিয়ম ছিল যে এণ্ট্রান্স পাশ করার চার বছর পর বি. এ. পরীক্ষা দেওয়া যায়। গঙ্গাপ্রসাদ এণ্ট্রান্স পাশ ক'রে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকেই তিনি বি. এ. পাশ করেন।

৺গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(জন্ম : ১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৩৬ মৃত্যু : ১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৮৯)

তখনকার দিনে বি. এ. পাশ করলে বড় সরকারী চাকরি পাওয়া যেত। অনায়াসেই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়া যেত। গঙ্গাপ্রসাদ কিন্তু চাকরিতে আকৃষ্ট হলেন না। মানুষের সেবা করতে পারবেন—এই আশায় ডাক্তারি পড়া শুরু করলেন। তারপর কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম. বি. পাশ ক'রে ডাক্তার হয়ে বেরুলেন।

ডাক্তারি পড়ার সময়েই গঙ্গাপ্রসাদ বিয়ে করেছিলেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল কাঁসারিপাড়া নিবাসী হরলাল চট্টোপাধ্যায়ের বড় মেয়ে

জগত্তারিণী দেবীর সঙ্গে। গঙ্গাপ্রসাদ যখন মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আশুতোষের জন্ম হয়।

মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র হিসাবে গঙ্গাপ্রসাদের বেশ সুনাম ছিল। কলেজের কয়েকটি বাৎসরিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। শুধু তাই নয়—ধাত্রীবিদ্যার পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে তিনি পদক উপহার পেয়েছিলেন।

তখন মেডিক্যাল কলেজে 'প্যাট্রিজ' নামে এক সাহেব অধ্যাপক ছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদকে ইনি উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেত পাঠাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু নানান্ কারণে তাঁর সে চেষ্টা সফল হয় নি।

যাক সে কথা।

ডাক্তারি পাশ করার পর গঙ্গপ্রসাদের শুভার্থীরা তাঁকে কলকাতার ভবানীপুরে থেকে ডাক্তারি করবার পরামর্শ দেন। সে পরামর্শ গ্রহণ করেন গঙ্গাপ্রসাদ। শুরু করেন ডাক্তার হিসাবে তাঁর কর্মজীবন।

ঐ সময় ভবানীপুরে গোপালচন্দ্র রায় নামে এক বিলেত-ফেরত এম. ডি. ডাক্তার ছিলেন। ভাল ডাক্তার হিসাবে তাঁর তখন খুব নাম ডাক। তিনি গঙ্গাপ্রসাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন। কিন্তু প্রবল বিচক্ষণতা, দৃঢ় সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়ের গুণে গঙ্গাপ্রসাদ অল্প কয়েকমাসের মধ্যেই তাঁর চেয়ে ভাল ডাক্তার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন।

গঙ্গাপ্রসাদের চরিত্রে অনেক সদ্‌গুণের সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি ছিলেন উন্নতমনা। অনেক অর্থ তিনি উপার্জন করেছিলেন কিন্তু তাই বলে তিনি অর্থলোভী ছিলেন না। শৈশবকাল থেকে ছাত্রজীবন পর্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়েছিলেন বলে দরিদ্রের দুঃখ তিনি বুঝতেন। তখন গঙ্গাপ্রসাদের ফি ছিল চার টাকা মাত্র। কিন্তু তিনি গরিব-দুঃখীদের কাছ থেকে ফি-এর টাকা নিতেন না; উপরন্তু নিজের ডাক্তারখানা থেকে বিনা পয়সায় ওষুধ-পত্রও দিতেন।

বই পড়তে খুব ভালবাসতেন গঙ্গাপ্রসাদ। প্রায় সব রকমের বই-ই তাঁকে পড়তে দেখা যেত। লেখাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সেকালের বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। বাল্মীকির রামায়ণের তিনি বাংলা পদ্যানুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদ বড় সুন্দর হয়েছিল। শোনা যায়—গঙ্গাপ্রসাদ নাকি ছাদে বেড়াতে বেড়াতেই খাতা হাতে ধরে অনুবাদ করতেন।

জগত্তারিণী দেবী
(মৃত্যু : ১৯শে এপ্রিল, ১৯১৪)

তখনকার দিনে মেডিক্যাল কলেজে দু'টি বিভাগ ছিল—ইংরেজী ও বাংলা। বাংলা বিভাগের ছাত্রদের জন্যে বাংলায় লেখা চিকিৎসা শাস্ত্রের বইয়ের বড় অভাব ছিল। এই অভাব পূরণের কাজে ব্রতী হন গঙ্গাপ্রসাদ। বাংলায় তিনি 'মাতৃশিক্ষা' নামে একখানি বই লেখেন। সেকালের মেয়েদের পক্ষে এ বইখানি ছিল অপরিহার্য।

জগত্তারিণী দেবীর সঙ্গে। গঙ্গাপ্রসাদ যখন মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আশুতোষের জন্ম হয়।

মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র হিসাবে গঙ্গাপ্রসাদের বেশ সুনাম ছিল। কলেজের কয়েকটি বাৎসরিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। শুধু তাই নয়—ধাত্রীবিদ্যার পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে তিনি পদক উপহার পেয়েছিলেন।

তখন মেডিক্যাল কলেজে 'প্যাট্রিজ' নামে এক সাহেব অধ্যাপক ছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদকে ইনি উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেত পাঠাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু নানান্ কারণে তাঁর সে চেষ্টা সফল হয় নি।

যাক সে কথা।

ডাক্তারি পাশ করার পর গঙ্গপ্রসাদের শুভার্থীরা তাঁকে কলকাতার ভবানীপুরে থেকে ডাক্তারি করবার পরামর্শ দেন। সে পরামর্শ গ্রহণ করেন গঙ্গাপ্রসাদ। শুরু করেন ডাক্তার হিসাবে তাঁর কর্মজীবন।

ঐ সময় ভবানীপুরে গোপালচন্দ্র রায় নামে এক বিলেত-ফেরত এম. ডি. ডাক্তার ছিলেন। ভাল ডাক্তার হিসাবে তাঁর তখন খুব নাম ডাক। তিনি গঙ্গাপ্রসাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন। কিন্তু প্রবল বিচক্ষণতা, দৃঢ় সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়ের গুণে গঙ্গাপ্রসাদ অল্প কয়েকমাসের মধ্যেই তাঁর চেয়ে ভাল ডাক্তার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন।

গঙ্গাপ্রসাদের চরিত্রে অনেক সদ্‌গুণের সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি ছিলেন উন্নতমনা। অনেক অর্থ তিনি উপার্জন করেছিলেন কিন্তু তাই বলে তিনি অর্থলোভী ছিলেন না। শৈশবকাল থেকে ছাত্রজীবন পর্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়েছিলেন বলে দরিদ্রের দুঃখ তিনি বুঝতেন। তখন গঙ্গাপ্রসাদের ফি ছিল চার টাকা মাত্র। কিন্তু তিনি গরিব-দুঃখীদের কাছ থেকে ফি-এর টাকা নিতেন না; উপরন্তু নিজের ডাক্তারখানা থেকে বিনা পয়সায় ওষুধ-পত্রও দিতেন।

সেকালের বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। বাল্মীকির রামায়ণের তিনি বাংলা পদ্যানুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদ বড় সুন্দর হয়েছিল। শোনা যায়—গঙ্গাপ্রসাদ নাকি ছাদে বেড়াতে বেড়াতেই খাতা হাতে ধরে অনুবাদ করতেন।

জগত্তারিণী দেবী

(মৃত্যু : ১৯শে এপ্রিল, ১৯১৪)

তখনকার দিনে মেডিক্যাল কলেজে দু'টি বিভাগ ছিল—ইংরেজী ও বাংলা। বাংলা বিভাগের ছাত্রদের জন্যে বাংলায় লেখা চিকিৎসা শাস্ত্রের বইয়ের বড় অভাব ছিল। এই অভাব পূরণের কাজে ব্রতী হন গঙ্গাপ্রসাদ। বাংলায় তিনি 'মাতৃশিক্ষা' নামে একখানি বই লেখেন। সেকালের মেয়েদের পক্ষে এ বইখানি ছিল অপরিহার্য।

এ ছাড়া আরও দু'খানি ডাক্তারি বই লিখেছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ। সে দু'খানি হচ্ছে 'শরীরবিদ্যা' এবং 'প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন'।

গঙ্গাপ্রসাদের একটি বিচিত্র খেয়াল ছিল। তা হচ্ছে দৈনন্দিন আয়-ব্যয়ের হিসেব লেখা। যেদিন থেকে তিনি ডাক্তারি শুরু করেন, সেইদিন থেকে এই হিসেব লেখাও শুরু করেন। কি না ছিল সেই হিসেবের খাতায়! কোন্ দিন রুগী দেখে কত পেয়েছেন, ওষুধ বেচেছেন কত টাকার, বাড়ি তৈরি করতে কত খরচ হয়েছে, ছেলেদের বিয়ে ও পৈতেতে কত খরচ হয়েছে, সব লেখা ছিল। এমন বিশুদ্ধভাবে হিসেবের খাতা লিখতে খুব কম লোককেই দেখা যায়।

ঘড়ির কাঁটা ধরে সময় মত রোজকার কাজ করা ছিল গঙ্গা-প্রসাদের চরিত্রের আর এক বৈশিষ্ট্য। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। আর ছিল সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করার স্পৃহা।

জীবনে গঙ্গাপ্রসাদ প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। নিজের উপার্জিত টাকায় ভবানীপুরের রসা রোডে একখানি বাড়িও তৈরি করেছিলেন। সতের বছর ঐ বাড়িতে তিনি বসবাস করেছিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদের দুই সন্তান। আশুতোষ বড় ও হেমন্তকুমার ছোট। বি. এ. পাশ করার পর মাত্র কুড়ি বছর বয়সে হেমন্তকুমারের অকাল-মৃত্যু হয়। দারুণ শোকে গঙ্গাপ্রসাদের শরীর ভেঙ্গে পড়ে। প্রাণাধিক পুত্রের স্মৃতি রক্ষার জন্যে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আড়াই হাজার টাকা দান করে যান। সেই টাকার সুদ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বছর হেমন্তকুমার পদক পুরস্কার দেন।

হেমন্তকুমারের মৃত্যুর পর মাত্র দু'বছর গঙ্গাপ্রসাদ জীবিত ছিলেন। ১৮৮৯ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তাঁর কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

দুই

গঙ্গাপ্রসাদ যখন ছাত্র, তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আশুতোষের জন্ম হয়। জন্মস্থান—কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলের ১৭ নম্বর মলঙ্গা লেনের এক ভাড়াটিয়া বাড়ি। জন্মকাল—সোমবার ১৮৬৪ সালের ২৯শে জুন।

জন্মের পর শিশু আশুতোষ বেশীর ভাগ সময় মায়ের সঙ্গে মামার বাড়ি কাঁসারিপাড়াতেই থাকতেন। বলতে গেলে তাঁর জীবনের প্রথম দু'বছর মামার বাড়িতেই কাটে। তাঁর মামা হরিলাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সেকালের একজন নামকরা পণ্ডিত। তিনি কলকাতার নর্মাল স্কুলে শিক্ষকতা করতেন।

ধীরে ধীরে শিশু আশুতোষ বড় হতে লাগলেন। মা-বাবা তাঁকে লেখাপড়া শেখাবার ব্যাপারে মন দিলেন। বাড়িতে প্রথম ভাগ পড়ানো শুরু করলেন।

ভবানীপুরে গঙ্গাপ্রসাদের ডাক্তারখানা ছিল। আশুতোষ পিতার সঙ্গে সেখানে যেতেন। দেখতেন রুগীরা লাল-নীল-গোলাপী রঙ-বেরঙের ওষুধ শিশি ভর্তি করে করে নিয়ে যায়। তাই দেখে শিশুরও ইচ্ছা হয় 'ওষুধ-ওষুধ' খেলার।

আশুতোষ ডাক্তারখানা থেকে কতকগুলি খালি শিশি নিয়ে আসেন। আর আনেন কিছু রং। বাড়িতে বসে রঙীন জল একবার এ শিশিতে ঢালেন, আর একবার ও শিশিতে ঢালেন। এমনিভাবে খেলা করেন।

একদিন বাড়ির পাশে বাঁধানো পুকুরঘাটে বসে আশুতোষ খেলা করছেন। শিশিতে রঙীন জল ভরছেন ও ঢালছেন। হঠাৎ পা পিছলে তিনি জলে পড়ে যান। কিন্তু কপাল ভাল। বাড়ির এক চাকর তা দেখতে পায় এবং শিশুকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসে।

এই ঘটনার পর থেকে গঙ্গাপ্রসাদ ছেলেকে সর্বদা চোখে-চোখে রাখতেন—সহজে কাছছাড়া করতেন না।

এই বয়সে একবার পূজার সময় আশুতোষ পাড়ার এক ভদ্র-লোকের বাড়িতে যাত্রা শুনতে যান। যাত্রা গানের আসরে সেদিন খুব গোলমাল হচ্ছিল। তাই দেখে আশুতোষ ভেবেছিলেন—যাত্রা মানেই বুঝি হৈ-হট্টগোলের আসর।

ক্রমে শিশুর বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হলো। প্রথমভাগ পড়া তখন শেষ হয়েছে। গঙ্গাপ্রসাদ ছেলেকে ভর্তি ক'রে দিলেন চক্রবেড়িয়া শিশু বিদ্যালয়ে। প্রথম দিন ইস্কুল থেকে ফিরেই আশুতোষ তাঁর পিতাকে বল্লেন ঃ বাবা, ওটা তো ইস্কুল নয়—যেন যাত্রাগানের আসর!

বাস্তবিকই তাই।

শিশু-ছাত্র ও শিক্ষক মশাইদের কলরব শুনে ঐ ইস্কুলকে যাত্রার আসর বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

নীলমণি মিত্র মশাইয়ের পূজার দালান। বড় একটি ঘর। একটি মাত্র ঘরে সব শ্রেণীর শিশু বসে পড়া তৈরি করছে। সেই সঙ্গে শিক্ষকমশাইদের তর্জন-গর্জন তো আছেই।

অন্য পিতা হলে শিশুপুত্রের এ অনুযোগে কান দিতেন না। কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদ তেমন লোক ছিলেন না। সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তাই সেইদিনই তিনি শিশু বিদ্যালয়ে গেলেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে তিনখানি আলাদা ঘরে স্কুল বসাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে এলেন।

অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ গঙ্গাপ্রসাদের নিত্যকার অভ্যাস। পুত্র আশুতোষকেও তিনি সেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। পিতাপুত্রে প্রাতঃ-ভ্রমণে বেড়াতে বেড়াতে গঙ্গাপ্রসাদ আশুতোষকে গল্পের ছলে মহাপুরুষদের জীবন-কাহিনী শোনাতেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা কথা বলতেন। বেড়িয়ে এসে আশুতোষ হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসতেন। প্রথমে পুরনো পড়াগুলি একবার ঝালিয়ে নিয়ে নতুন পড়া ধরতেন। দুপুরে যেতেন বিদ্যালয়ে।

এই বিদ্যালয়ে আশুতোষ ১৮৬৯ থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত পড়েছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি সাতটি শ্রেণীর পাঠ শেষ ক'রে ফেলেছিলেন। কি রকম প্রতিভা থাকলে এটা সম্ভব হয়—ভাব দেখি একবার!

এই সময় ইংরাজীও অনেকটা আয়ত্ত করেছিলেন আশুতোষ। হোমারের 'ইলিয়ড', মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট', ক্যাম্বেলের 'প্লেজারস অফ হোপ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং 'রবিন্সন ক্রুসো', 'গালিভার্স ট্রাভেল' প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থ থেকে শত শত লাইন মুখস্থ বলতে পারতেন। শুধু তাই নয়—মূল ইংরাজীর বাংলা অনুবাদও আবৃত্তি করতেন।

আশুতোষ লেখাপড়ায় অতিরিক্ত মনোযোগী ছিলেন—মেধাবী ছাত্র ছিলেন তো বটেই। কিন্তু নিতান্ত শান্তশিষ্ট গো-বেচারীটি ছিলেন না। তাঁর যে কি রকম দুষ্টুমি বুদ্ধি ছিল তার একটা গল্প বলি। শোন:

ছোট ভাই হেমন্তকুমারের চেয়ে আশুতোষ ছিলেন আড়াই বছরের বড়। হেমন্তকুমার দেখতে শুনতে বেশ ভাল ছিলেন। ফর্সা এবং সুশ্রী গড়নের এই ছোট ছেলেটিকে বাড়ির সবাই একটু বেশী আদর করতেন। আশুতোষের তা সহ্য হতো না। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে তিনি খুবই রাগতেন। হেমন্তকে জব্দ করার চেষ্টা করতেন।

এই হিংসের ফল অনেক দূর গড়ালো। আশুতোষের বয়স তখন চার কি পাঁচ বছর হবে। একদিন একটা লোহার রড্ আচ্ছা করে তাতিয়ে তিনি হেমন্তকে ধরতে বল্লেন। শিশু হেমন্ত দাদার দুষ্টুমি না বুঝে সেটি চেপে ধরলো। যেই না ধরা—অমনি 'বাপরে মারে' বলে সে কি চীৎকার!

বাড়ির যে যেখানে ছিলেন ঐ চীৎকার শুনে ছুটে এলেন। গঙ্গাপ্রসাদ ছেলের হাতে মলমের প্রলেপ লাগালেন। জ্বালা একটু কমলে ছেলে শান্ত হলো।

গতিক খারাপ বুঝে ইতিমধ্যে আশুতোষ পালিয়েছিলেন। হেমন্ত শান্ত হলে আশুতোষের খোঁজ পড়লো। অনেক ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সবাই তখন উদ্বিগ্ন হ'য়ে তাঁকে খুঁজতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে শ্রীমানকে আবিষ্কার করা হলো গাড়ির ভেতর থেকে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গাড়ির মধ্যে লুকিয়ে বসেছিলেন তিনি।

আশুতোষের দুষ্টুমি
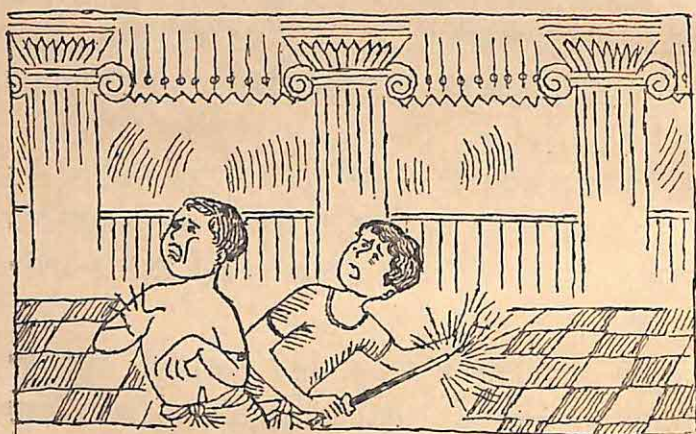
চক্রবেড়িয়া শিশুবিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ হলো। গঙ্গাপ্রসাদ তখনই ছেলেকে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করলেন না। নিজে ছেলের শিক্ষার ভার নিলেন। নিজে তো পড়াতেনই, উপরন্তু যোগ্য গৃহ-শিক্ষকও নিযুক্ত করেছিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদের যথেষ্ট অধ্যবসায় ছিল, সেই সঙ্গে ছিল প্রখর স্মৃতিশক্তি। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের নানা বই তিনি পড়ে আয়ত্ত ক'রে ফেলেছিলেন। বয়সের তুলনায় অনেক উঁচু শ্রেণীর বই তিনি পড়েছিলেন—অনেক বেশী জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

ছাত্রাবস্থায় গঙ্গাপ্রসাদ খুব ভাল ম্যাপ আঁকতে পারতেন। তাঁর আঁকা ম্যাপগুলি এতই সুন্দর হতো যে হেয়ার স্কুলে সেগুলি যত্ন ক'রে

রোলারে জড়িয়ে রাখা হতো। গঙ্গাপ্রসাদ আশুতোষকেও নিজে বসে ম্যাপ আঁকা শেখালেন।

গঙ্গাপ্রসাদ ছেলেবেলায় সব কাজই মন দিয়ে করতেন ; শিক্ষণীয় বিষয়গুলি খুব ভালভাবে শিখতেন। ছেলেকেও তিনি সেই শিক্ষা দিতেন। বলতেন ঃ কোন বিষয় ভালভাবে বুঝতে না পারা পর্যন্ত ছাড়বে না। কোন কাজ দায়সারা মত ক'রে সারবে না। যত তুচ্ছ কাজই হোক না কেন, সর্বান্তঃকরণে তা করবে। ভাল করে শিখবে।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র ছিলেন গঙ্গাপ্রসাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। একদিন দ্বারকানাথ এলেন গঙ্গাপ্রসাদের বাড়ি। শিশু আশুতোষ সেই প্রথম দেখলেন দ্বারকানাথকে। গঙ্গাপ্রসাদ আশুতোষের সঙ্গে দ্বারকানাথের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আশুতোষ দ্বারকানাথের মধ্যে কি দেখেছিলেন জানি না, তবে সেইদিন থেকেই তাঁর সাধ হলো বড় হয়ে জজ হবেন। পিতাও তাঁর এই সাধে উৎসাহ দিতে লাগলেন। পিতা-মাতার আশীর্বাদে এবং নিজের অদম্য চেষ্টায় উচ্চাভিলাষী শিশুর সাধ একদিন পূর্ণ হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।

আশুতোষ পিতার কাছে পড়তেন, মাতার কাছে লেখা শিখতেন। রুগী দেখার চাপে গঙ্গাপ্রসাদ সব সময় ছেলেকে কাছে বসে পড়া দেখাতে পারতেন না। তবে মাঝে মাঝে একটু অবসর পেলেই ঘরে এসে দেখতেন—ছেলে কি করছে না করছে।

মা জগত্তারিণী দেবীও গঙ্গাপ্রসাদের মত ছেলেকে সৎ উপদেশ দিতেন। তার লেখাপড়া ও উচ্চাভিলাষে উৎসাহ দিতেন। বলতেন ঃ 'বড় হবই হব'—এই প্রতিজ্ঞা কর এবং সেই অনুযায়ী সব সময় চেষ্টা কর। তাহ'লে বিদ্যা, ধন, মান—সব কিছুরই অধিকারী হতে পারবে।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ সব সময়ে ছেলেকে নজরে নজরে রাখতেন। কুসংসর্গে পড়ে ছেলে যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

তাই আশুতোষকে তিনি কারুর বাড়ি যেতে দিতেন না। কোন বাজে ছেলেকেও তাঁর কাছে আসতে দিতেন না।

বাংলা ১২৮১ সনে আশুতোষের বুকের পীড়া হলো। গঙ্গাপ্রসাদ ছেলেকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলেন ডাক্তার চার্লসের কাছে। চার্লস সাহেব তখন কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের বিখ্যাত ডাক্তার। উনি আশুতোষকে পরীক্ষা ক'রে বেশ কিছুদিন বিশ্রামের উপদেশ দিলেন।

সেই উপদেশ অনুযায়ী আশুতোষের লেখাপড়া বন্ধ করা হলো ; কিন্তু রোগের উপশম হলো না। একটু পরিশ্রম করলেই বুক ধরফর করতো। তাই দেখে গঙ্গাপ্রসাদ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। হাওয়া বদলাবার জন্য ছেলেকে মথুরায় পাঠতে মনস্থ করলেন। মথুরায় গঙ্গাপ্রসাদের বন্ধু শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় থাকতেন। আশুতোষ সেখানে গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

মথুরায় কয়েক মাস থাকার পর শরীর একটু সারলো। আশুতোষ বেশ হৃষ্টপুষ্ট হলেন। পাছে বেশী মোটা হয়ে পড়েন—এই ভয়ে তিনি ব্যায়াম-চর্চাও আরম্ভ করলেন। তারপর শীঘ্রই কলকাতা রওনা হলেন।

কলকাতা যাওয়ার পথে মোগলসরাই স্টেশনে আশুতোষের সঙ্গে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎ হলো। সে-ই প্রথম সাক্ষাৎ। বিদ্যাসাগর মশাই এই শিশুর সঙ্গে কথা বলে প্রীত হলেন। বুঝতে পারলেন—এর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।

পরে কলকাতায় এক বিলাতী বইয়ের দোকানে বিদ্যাসাগর মশাই আশুতোষকে দ্বিতীয় বার দেখেন। তিনি ভালবেসে এক কপি 'রবিন্‌সন্‌-ক্রুসো' বই কিনে তাঁকে উপহার দেন। আর বলেন ঃ খোকা এ বইখানি মন দিয়ে পোড়ো। কেমন ?

আশুতোষ সত্যিই খুব মন দিয়ে বইখানি পড়েছিলেন এবং সারা জীবন ঐ মনীষীর নামসই যুক্ত বইখানি সযত্নে নিজের কাছে রেখেছিলেন।

তি ন

মথুরা থেকে আশুতোষ সুস্থ হয়ে ফিরলে তাঁকে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করা স্থির হলো। তখনকার দিনে কলকাতার ভাল ভাল স্কুলগুলির মধ্যে সাউথ সুবার্বন স্কুল ছিল অন্যতম। এখানকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই। আর সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত উকিল আশুতোষ বিশ্বাস। আশুতোষবাবু ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাসের পিতা।

১৮৭৫ সালে গঙ্গাপ্রসাদ আশুতোষকে এই স্কুলে ভর্তি করবার জন্যে নিয়ে গেলেন। তখনকার দিনে দশম শ্রেণীকে বলা হতো ফার্স্ট ক্লাশ, নবম শ্রেণীকে বলা হত সেকেণ্ড ক্লাশ। এই নিয়মে অষ্টম শ্রেণীকে থার্ড ও সপ্তম শ্রেণীকে ফোর্থ ক্লাশ বলা হতো।

স্কুলে ভর্তির আগে ছাত্রকে পরীক্ষা করে নেবার ব্যবস্থা তখনকার দিনেও প্রচলিত ছিল। আশুতোষকেও তাই পরীক্ষা করা হলো। দেখা গেল—তিনি থার্ড ক্লাশের উপযুক্ত। কিন্তু বয়স কম বলে তাঁকে ফোর্থ ক্লাশে ভর্তি করা হলো। আশুতোষের বয়স তখন এগারো বছর মাত্র।

তখনকার দিনে স্কুলে ছাত্রদের ওঠা-নামার রীতি প্রচলিত ছিল। যে ছেলে যেদিন ক্লাশের সব পড়া ভালভাবে বলতে পারতো সে প্রথম বলে বিবেচিত হতো। তাকে প্রথম বেঞ্চির প্রথম স্থানে বসতে দেওয়া হতো। তারপর এই নিয়মে বসতো দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও অন্যান্যেরা।

স্কুলে ভর্তির প্রথম দিনেই গঙ্গাপ্রসাদ ছেলেকে উৎসাহ দিলেন। বল্লেন ঃ দেখ আশু, যতদিন তুমি ক্লাশে প্রথম হবে, ততদিন রোজ একটাকা করে পুরস্কার পাবে। আর দ্বিতীয় হলে আট আনা পাবে।

আশুতোষ উৎসাহিত হলেন পিতার কথায় তিনি খুব মন দিয়ে পড়া তৈরি করতে লাগলেন। প্রায় রোজই ক্লাশে প্রথম হয়ে একটাকা

ক'রে পুরস্কার পেতেন। দ্বিতীয় পুরস্কার পেতেন বছরে দুই কি তিন দিন।

আগেই বলেছি, আশুতোষ তাঁর বয়সের তুলনায়, ক্লাশের তুলনায় অনেক বেশী পড়ে ফেলেছিলেন। অঙ্কশাস্ত্র খুব ভাল লাগতো তাঁর। এই সময় তিনি বীজগণিত ও জ্যামিতির বহু কঠিন তত্ত্ব আয়ত্ত ক'রে ফেলেছিলেন। ইউক্লিডের জ্যামিতি সবটা পড়ে ফেলেছিলেন। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ব্যাকরণ কৌমুদী তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। এডমণ্ড বার্কের রচনাবলীও তাঁর মুখস্থ ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্তের গ্রন্থাবলী পড়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। উপন্যাস পাঠে তাঁর মন ছিল না। মন যাতে উন্নত হয়—এমন বই ভিন্ন অন্য বই কখনও তিনি পড়তেন না।

অষ্টম শ্রেণীতে উঠে আশুতোষ বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, কথামালা প্রভৃতি গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন। এমন কি, মার্সডেন সাহেবের লেখা ইংরাজী বই 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এর বাংলা অনুবাদও করেছিলেন। নবম শ্রেণীতে পড়বার সময় সতীদাহ প্রথার ওপর তিনি যে ইংরেজী প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, বি. এ. পাশ অনেক বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষেও তা আদর্শস্বরূপ ছিল। এর থেকেই তোমরা বুঝতে পারছ যে ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে ঐ অল্প বয়সেই আশুতোষ কি রকম জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতিও আশুতোষের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। সপ্তম শ্রেণী থেকে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন। সেই সময় থেকে প্রতিদিন তিনি এক ঘণ্টা ক'রে সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য ও নাটক পড়তেন। ঊনিশ বছর ধরে নিয়মিতভাবে সংস্কৃত সাহিত্য পড়েছিলেন আশুতোষ। তাঁর সংস্কৃতের শিক্ষক ছিলেন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পঞ্চানন পালধি মশাই।

আশুতোষের গৃহশিক্ষকদের মধ্যে দু'জনের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন হারাধন নাগ ও মধুসূদন দাস। নাগমশাই ছিলেন একজন বিখ্যাত আইনজীবী ও আইন অধ্যাপক। দাসমশাইও কম

ছিলেন না। তিনি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য এবং বিহার-উড়িষ্যার মন্ত্রী ছিলেন। এই রকম প্রতিভাবান দুই গৃহ-শিক্ষকের সাহচর্যে থেকে বিদ্যালাভ করার সৌভাগ্য ক'জনার ভাগ্যে ঘটে ?

গোড়া থেকেই গঙ্গাপ্রসাদ ঠিক করেছিলেন যে ছেলেকে ডাক্তারি পড়াবেন না। তাছাড়া শৈশবকাল থেকেই আশুতোষের ইচ্ছা ছিল—তিনি জজ্ হবেন। কিন্তু জজ্ তো সরাসরি হওয়া যায় না। আগে ভাল উকিল হতে হয় ; আর ভাল উকিল হতে হ'লে ভাল বক্তৃতা করার ক্ষমতা থাকা দরকার। বালক আশুতোষের তো সে ক্ষমতা বিন্দুমাত্র নেই। বড় মুখচোরা সে।

তাই গঙ্গাপ্রসাদ একটি ছোট টুল তৈরী করালেন। তারপর ছেলেকে বল্লেন ঃ ঐ টুলের ওপর দাঁড়িয়ে তুমি স্কুলের পড়া আবৃত্তি কর। আর দেখ আবৃত্তি করার সময় এমন ভাবভঙ্গি করবে যেন মনে হয় যে তুমি বক্তৃতা দিচ্ছ।

সেই থেকে শুরু হলো আশুতোষের বক্তৃতার অনুশীলন।
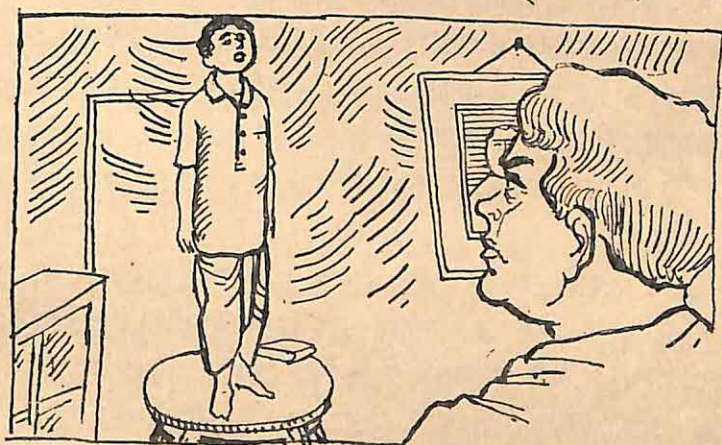
বালক আশুতোষ বক্তৃতা দিচ্ছেন

এই খানেই কিন্তু শেষ নয়। বক্তৃতা সম্পর্কে কয়েকখানি ভাল ইংরেজী বই গঙ্গাপ্রসাদ কিনে আনলেন। বইগুলি আশুতোষকে

পড়ালেন। তার বক্তৃতায় ভাষা ও উচ্চারণের ওপরও যথেষ্ট নজর রাখলেন। কোন শব্দ উচ্চারণে ভুল হ'লে গঙ্গাপ্রসাদ তা ধরিয়ে দিতেন। আশুতোষকে সে ভুল নিজেই সংশোধন করতে হতো। এজন্যে বক্তৃতা করার টুলের কাছে একটা চেম্বার্সের অভিধান রাখা থাকতো।

ছেলেবেলা থেকে এমনিভাবে বক্তৃতার অনুশীলন করার ফলে পরবর্তী জীবনে আশুতোষ সুবক্তা হতে পেরেছিলেন। সে পরিচয় তোমরা পরে পাবে।

বই পড়া ছিল আশুতোষের নেশা।

স্কুলের বই পড়ে তাঁর মন ভরতো না। হাতের কাছে সৎগ্রন্থ পেলেই তিনি মন দিয়ে তা পড়ে ফেলতেন। শব্দের অর্থ জানা না থাকলে অভিধান দেখে নিজেই তা জেনে নিতেন। গৃহশিক্ষক ছিল বলে মনে কোরো না যে তিনি গৃহশিক্ষকের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। গৃহশিক্ষকগণ তাঁর জ্ঞান লাভে নানা ভাবে সাহায্য করতেন মাত্র। উচ্চারণগত বা ব্যাকরণগত ভুল হলে তা ধরিয়ে দিতেন। সংশোধনের ভার থাকতো ছাত্রের ওপর। ছাত্র একান্তই না পারলে তাঁরা তা ক'রে দিতেন। হয়তো কিছু লিখতেন আশুতোষ। লেখা সংশোধন করে দিতেন গৃহশিক্ষকেরা। এমনি ভাবে স্কুল, গৃহশিক্ষক ও পিতামাতার সাহায্যে আশুতোষের লেখাপড়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে লাগলো।

আর একটি সৎগুণ ছিল বালক আশুতোষের। তা হচ্ছে ঘড়ির কাঁটার মত নির্ধারিত সময়ে সব কাজ করা। গৃহশিক্ষকদের আসবার সময় নির্দিষ্ট ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগেই বই খাতাপত্র গুছিয়ে আশুতোষ বসে থাকতেন। আগেই সব পড়া ঠিক মত তৈরি করে রাখতেন। শিক্ষকমশাই আসামাত্র বিনা বাক্যব্যয়ে পড়া আরম্ভ করতেন। একটুও সময় নষ্ট করতেন না।

এই বয়স থেকেই আশুতোষ সময়ের মূল্য বুঝেছিলেন। তাই আলস্যে বা তাস-পাশা খেলে অযথা তিনি কখনও সময় নষ্ট করতেন

না। একটি দিনও না। রাত্রে শোবার আগে মাথার কাছে একটি প্রদীপ ও দিয়াশলাই রাখতেন, যাতে ভোরবেলায় সূর্যোদয়ের আগে উঠে সময় নষ্ট না করেই পড়ায় বসতে পারেন।

আশুতোষের পড়ার প্রণালী কেমন ছিল তাও জেনে রাখ। তিনি যখনই কিছু পড়তেন, জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে পড়তেন। পরীক্ষায় পাশের উদ্দেশ্যে নিছক মুখস্থ করতেন না। আর না বুঝে কখনও কিছু পড়তেন না। জীবনে কোনদিন নোট বই বা ঐ জাতীয় অর্থ পুস্তক তিনি কখনও পড়েন নি। খুঁটিয়ে নাটিয়ে সব বই পড়া ছিল তাঁর বরাবরের অভ্যাস। প্রখর স্মৃতিশক্তি ও অধ্যবসায় থাকার দরুণ যা পড়তেন তা-ই প্রায় মুখস্থ হয়ে যেতো। মুখস্থ করার জন্যে কখনও বেগ পেতে হতো না। তাই অষ্টম শ্রেণীতে পড়বার সময় আশুতোষ যখন লর্ড মেকলের লেখা হেষ্টিংস ও ক্লাইভ সম্পর্কিত ইংরেজী প্রবন্ধটি গড় গড় করে মুখস্থ বলে যেতেন, তখন সবাই আশ্চর্য হয়ে যেতেন বালকের স্মৃতিশক্তি দেখে। গোটা ছাত্রজীবনে এই একই প্রণালীতে আশুতোষ পড়াশুনা করেছিলেন।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষার মাস তিনেক আগে আশুতোষের সারা শরীরে একজিমা রোগ দেখা দেয়। রোগ এমন প্রবল আকার ধারণ করে যে অনেক সময় তিনি নড়তে চড়তেও পারতেন না। বিছানায় শুয়ে থাকতে বাধ্য হতেন। শরীরের এই অবস্থা নিয়েই আশুতোষ এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেন।

১৮৭৯ সালের নভেম্বর মাসে পরীক্ষা হলো। ডিসেম্বর মাসে ফল বেরুলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করতে পারলেন না আশুতোষ। তিনি হলেন দ্বিতীয়।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় আশুতোষের এই অসাফল্যের কারণ দু'টি। প্রথমতঃ অসুস্থতা। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর লিখতে না পারা। হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের মত তখন সাউথ সুবার্বন স্কুলে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর লেখার কৌশল শেখানো হতো না। তাই আশুতোষও এ কৌশলটি ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারেন নি।

যাই হোক আশুতোষ মাত্র পনর বছর বয়সে এণ্ট্রান্স পাশ করলেন। তিনি সাউথ স্থবার্বন স্কুল থেকে এই পরীক্ষায় সর্বোচ্চ বৃত্তি পেলেন। বৃত্তির পরিমাণ মাসিক কুড়ি টাকা।

চার

এণ্ট্রাস পাশ ক'রে আশুতোষ ভর্তি হলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। সেটা ১৮৮০ সালের জানুয়ারি মাস।

প্রেসিডেন্সী কলেজ বরাবরই বাংলাদেশের সেরা কলেজ। সেরা ছাত্র—সেরা অধ্যাপক। তখন ঐ কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন রো সাহেব—এফ. জে. রো। গণিতের অধ্যাপক ছিলেন বুথ সাহেব। অধ্যাপক রবসন অনুবাদ করা শেখাতেন ও ব্যাকরণ পড়াতেন। ইংরেজীর আর একজন অধ্যাপক তখন সবে বিলেত থেকে এসেছেন। তিনি অধ্যাপক পার্সিভ্যাল। অধ্যক্ষ ছিলেন সি. এইচ. টনি। টনি সাহেবও ইংরেজী পড়াতেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়া ছিল ব্যয়বহুল। অভিজাত সম্প্রদায়ের ভাল ছেলেরাই এখানে পড়তে আসতেন। ধনীর সন্তান বলে অধিকাংশ ছাত্রেরই পরণে থাকতো বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ, পায়ে পালিশ করা চকচকে জুতো, পরণে চাকরের হাতে কোঁচানো মিহি ধোপ-ভাঙ্গা সাদা ধবধবে ধুতি, গায়ে গিলে-করা পাঞ্জাবি। নিত্য নতুন সাজে তারা কলেজে আসতেন। তাঁদের চাল-চলন, আদব-কায়দা, বাবুগিরি ভাল লাগতো না আশুতোষের। পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল হওয়া সত্ত্বেও আশুতোষ বাবুগিরিকে দু'চোখে দেখতে পারতেন না। সাধারণ ধুতি-চাদর পরেই বরাবর তিনি কলেজে যেতেন। সহপাঠীদের সঙ্গে বড় একটা মিশতেন না। সহপাঠীরাও আশুতোষকে নীরস মনে ক'রে এড়িয়ে যেতেন। নগণ্য মনে ক'রে পরিহাস করতেন।

গণিতের অধ্যাপক বুথ সাহেব ছিলেন সাদাসিধে আত্মভোলা প্রকৃতির মানুষ। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝতে পারবে তা।

বুথ সাহেব তখন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ। কলেজে তখন এফ. এ. পরীক্ষা বসেছে। এফ. এ. হচ্ছে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সমতুল্য। বুথ সাহেব হঠাৎ পরীক্ষা-গৃহে ঢুকলেন। ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন যে একটি ছেলে খাতায় অঙ্ক কষতে গিয়ে বার বার ভুল করছে। ভোলানাথকল্প অধ্যাপক স্থান কাল ভুলে গেলেন। ছাত্রটির খাতায় অঙ্কটি ঠিকভাবে কষে দিয়ে শিস্ দিতে দিতে বেরিয়ে গেলেন। সবাই অবাক!

এই বুথ সাহেবের বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন আশুতোষ। আশু-তোষের সাদাসিধে পোষাক ও চালচলন প্রথমেই বুথ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিজে সরল মানুষ বলে এই সরল ছেলেটিকেও তিনি ভালবেসে ফেল্লেন। তিনি আশুতোষের নাম দিলেন 'সরল মানুষ'। আশুতোষকে বুথ সাহেবের ভাল লাগার আর একটি কারণ হচ্ছে—গণিতের প্রতি আশুতোষের প্রগাঢ় অনুরাগ।

শুধু বুথ সাহেব কেন, কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকেরাও শীঘ্রই আশুতোষকে চিনে ফেল্লেন। সকলেই তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন। মুগ্ধ হওয়ারই কথা। তখনকার দিনে অনেক ভাল ছাত্র ছিলেন যাঁরা আগামী কালের পড়া আজই তৈরি করে রাখতেন। কিন্তু আশুতোষ ছিলেন অনন্যসাধারণ। এ তো তিনি করতেনই, উপরন্তু এফ. এ. ক্লাশে থাকতেই এম. এ. ক্লাশের পাঠ্য গণিত পড়ে তৈরি ক'রে ফেলেছিলেন। অন্যান্য বিষয়েও তিনি বরাবর যথেষ্ট এগিয়ে থাকতেন। এ হেন ছাত্র যে সব অধ্যাপকেরই প্রিয়পাত্র হবেন—তাতে আর সন্দেহ কি!

আশুতোষ তখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। অধ্যাপক রবসন একদিন ক্লাশে এলেন। কক্স্ সাহেবের লেখা 'গ্রীসের পৌরাণিক কাহিনী' শীর্ষক বই থেকে একটি কাহিনী ছাত্রদের পড়ে শোনালেন। তারপর বল্লেনঃ এ কাহিনীটি তোমরা নিজের ইংরেজীতে লিখে দেখাও।

সব ছাত্রই লিখলেন। আশুতোষ খাতা দেখাতেই অধ্যাপক সাহেব তো চটে লাল। বই দেখে লেখা—নকল করা! আশুতোষ অধ্যাপক মশাইকে বোঝালেন—ও বইখানি তাঁর কাছে নেই। নকল করবেন কোথা থেকে? একবার কিছু শুনলেই তাঁর মনে থাকে। সেই জন্যে লিখতে গিয়ে অনেকটা মূল বইয়ের ভাষাই হয়ে যায়।

প্রথমে এ কথা অধ্যাপক রবসন বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তিনি আশুতোষকে তিরস্কার করলেন। পরে আরও দু' একবার পরীক্ষা ক'রে বুঝলেন যে, ছাত্রের কথাই ঠিক। তখন তিনি আশুতোষের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পেয়ে শুধু মুগ্ধই হলেন না—বিস্মিতও হলেন। তবে তিনি সেই সঙ্গে একটি ভাল উপদেশও দিলেন। বল্লেন ঃ স্মৃতিশক্তির দ্বারা যদি তুমি বইয়ের ভাষা মুখস্থ কর, তবে কিছু শিখতে পারবে না। মন দিয়ে শুনবে—মনেও রাখবে। কিন্তু লিখবার সময় বইয়ের একটি কথাও ব্যবহার করবে না। তবেই ভাষায় তোমার মৌলিকতা প্রকাশ পাবে।

আশুতোষ নিজেই বলে গেছেন যে, তাঁর জীবনে উন্নতির মূলে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়া। কলেজের বিরাট বিশাল লাইব্রেরী দেখে আশুতোষ প্রথম দিনই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল ঃ

> জ্ঞানের কত বিষয়ই না আছে! আর বইয়েরও অন্ত নেই। একজনের পক্ষে সারা জীবনে এইসব পড়ে শেষ করা কি সম্ভব? শুনেছি—মানুষের চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। আমিও কি তাহলে চেষ্টা করলে এই সব বই পড়ে ফেলে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারব?

—দৃঢ়চেতা আশুতোষের মন সায় দিল—হ্যাঁ, পারব।

সেইদিন থেকেই শুরু হলো জ্ঞানান্বেষণের কঠোর সাধনা। কলেজে ক্লাশ করতেন। অবসর পেলেই গিয়ে বসতেন লাইব্রেরীতে। বই পড়তেন। সেখানে দেশ-বিদেশের মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক

পত্রিকার ছড়াছড়ি। সেগুলি পড়তেন। অন্যান্য ছাত্রেরা তখন বৃথা গল্পে ও আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাতেন।

আগেই বলেছি যে, গণিত-শাস্ত্রে বরাবরই আশুতোষের ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময়ই তিনি এম. এ. পরীক্ষার জন্যে নির্দিষ্ট গণিতের বইগুলি পড়ে শেষ করে ফেলেছিলেন। ছেলের এই অতিরিক্ত পড়াশুনার জন্যে গঙ্গাপ্রসাদও অকাতরে অর্থব্যয় করতেন। সেই বছর অর্থাৎ ১৮৮০ সালে ছেলের জন্যে গঙ্গাপ্রসাদ কত টাকার গণিতের বই কিনেছিলেন জান? ৯৭০ টাকার। এর থেকেই বুঝতে পারছ—ছেলের শিক্ষার ব্যাপারে গঙ্গাপ্রসাদ কি রকম আগ্রহশীল ছিলেন।

তখনকার দিনে বিখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ লাপ্লাসের বইগুলি খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু তাঁর সব বই-ই ফরাসী ভাষায় লেখা। আশুতোষ দেখলেন যে গণিত-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হলে লাপ্লাসের বইগুলি অবশ্যই পড়া দরকার। আর সেজন্যে তাঁর ফরাসী ভাষা শেখা দরকার। আশুতোষ তাই ফরাসী ও ল্যাটিন ভাষাশিক্ষার বই কিনলেন। বাড়িতে বসে নিজের চেষ্টাতেই এই দুই ভাষা আয়ত্ত করতে লাগলেন। তারপর একে একে শেষ করলেন লাপ্লাসের দুরূহ গণিতের বইগুলি। তাহলে দেখ—ঐকান্তিক ইচ্ছে ও অধ্যবসায় থাকলে মানুষ সবই পারে।

আশুতোষের বয়স যখন ষোল বছর তখন তিনি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। এই অল্প বয়সেই তিনি একটি মৌলিক কাজ করেছিলেন। ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম ভাগের পঁচিশ নম্বর উপপাদ্যের নতুন একটি প্রমাণ আবিষ্কার করেছিলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজের লাব্রেইরীতে মৌলিক প্রবন্ধ ও গবেষণা সম্বলিত অনেক পত্র-পত্রিকা আসতো। আশুতোষ সেগুলি পড়তেন। তাঁর ইচ্ছা হলো যে নিজের মৌলিক আবিষ্কারটিও ঐ রকম কোন পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কিন্তু মনে সংশয়ও জাগলো। ঐ সব কাগজে বিলাতের নামকরা পণ্ডিতেরা লেখেন। তাঁদের লেখার সঙ্গে

কি তাঁর লেখা স্থান পাবে ? তবুও সংশয় কাটিয়ে তিনি ওটি প্রকাশের জন্যে কেম্ব্রিজের 'মেসেঞ্জার অফ ম্যাথেমেটিক্স' পত্রিকায় পাঠালেন। পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ঐ প্রমাণটি প্রকাশ করলেন। এই তরুণ বয়সে এত বড় সম্মান ক'জনার ভাগ্যে ঘটে—তোমরাই বল।

গণিত-শাস্ত্র ভাল লাগলেও অন্যান্য বিষয়ের প্রতি আশুতোষ কখনও উদাসীন ছিলেন না। ইংরেজী সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃত, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়গুলি তিনি খুবই মনোযোগ সহকারে পড়তেন। সব বিষয়ের উপরই যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেন। তবে গণিতের পরই তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল ইতিহাস। অতীতের সাক্ষী ইতিহাস পড়তে গিয়ে অনেক সময় আশুতোষ নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতেন। তন্ময় হয়ে যেতেন জাতির উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত পাঠ করতে করতে।

কাজে আনন্দ লাভ করা আশুতোষের চরিত্রের আর এক বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মানুষ অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কাজ তাদের কাছে একটা গুরুভার বলে মনে হয় বলেই ঐ ক্লান্তি আসে। কিন্তু আশুতোষ ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। কাজে তিনি আনন্দ পেতেন। প্রচুর কাজ করে পরিশ্রম করেও তাঁর ক্লান্তি আস্‌তো না। দিনরাত বই পড়তে পড়তে তিনি তন্ময় হয়ে থাকতেন। খেলাধূলা গল্প-গুজবের মতই আশুতোষ কাজ করে আনন্দ পেতেন! কিন্তু এইখানেই একটা মস্ত ভুল করেছিলেন আশুতোষ। শারীরিক সামর্থ্যকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর মানসিক পরিশ্রম। আর তার ফলেই মস্তিষ্কের পীড়ায় তিনি শীঘ্রই শয্যাগত হয়ে পড়েছিলেন।

আশুতোষ সকালে ন'টা পর্যন্ত লেখাপড়া করতেন। তারপর যেতেন কলেজে। কলেজ থেকে ফিরতে বেলা পাঁচটা হয়ে যেতো। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে জলখাবার খেতে খেতেই সন্ধ্যা। কাজেই দিনের বেলায় তাঁর বেশী পড়াশুনা হতো না। রাত্রে তাই বেশী করে পড়ার দরকার হতো। কিন্তু পিতার আদেশ ছিল—রাত্রে বেশীক্ষণ পড়া চলবে না। রাত্রি দশটার মধ্যে যতটুকু হয় পড়বে, কিন্তু তার

বেশী কোন মতেই নয়। শুধু তাই নয়—নিজে ডাক্তার ছিলেন বলে শরীরের প্রতি যত্ন নেবারও উপদেশ দিয়েছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ। বলেছিলেন ঃ—

> পরিশ্রমের সঙ্গে বিশ্রামও দরকার। আবার শুধু মানসিক পরিশ্রম করলে চলবে না, সেই সঙ্গে কায়িক শ্রমও চাই। কায়িক শ্রম একেবারে না করে শুধু মস্তিষ্ক চালনা করলে দৃষ্টিশক্তি কমে যায়, ক্ষিদে নষ্ট হয়, মাথা ঘোরে, বদহজম হয় এবং বাত রোগ দেখা দেয়। অতএব মানসিক শ্রম যেমন করছ কর, সেই সঙ্গে ব্যায়াম করে যাও। মনে রেখ—যার শরীর অসুস্থ, তার দ্বারা জগতে কোন মহৎ কাজ সম্পাদিত হতে পারে না।

শুধু উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না গঙ্গাপ্রসাদ। ছেলে উপদেশ পালন করছে কিনা তাও দেখতেন। গঙ্গাপ্রসাদ রাত দশটার সময় শুতেন। তাঁর শোবার ঘরে যাওয়ার পথে আশুতোষের ঘর পড়তো। ছেলের ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি দেখতেন ঘরে আলো জ্বলছে কিনা।

আশুতোষ কিন্তু পিতার এ উপদেশ পালন করতেন না—পাছে জ্ঞানস্পৃহা অতৃপ্ত থেকে যায়, পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল করা না যায় —এই ভয়ে। তাই তিনি পিতার পায়ের চটির শব্দ শুনলেই প্রদীপ নিভিয়ে শুয়ে পড়তেন। তার আধঘণ্টা বাদেই আবার উঠে প্রদীপ জ্বালিয়ে পড়তে বসতেন। রাত দেড়টা—দুটা পর্যন্ত পড়তেন। বেশ কয়েকমাস এইভাবে লুকিয়ে-চুরিয়ে আশুতোষ রাত জেগে পড়লেন। তারপর একদিন হাতেনাতে ধরা পড়লেন।

১৮৮১ সাল, জানুয়ারি মাস। হঠাৎ একদিন মাঝরাতে গঙ্গাপ্রসাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘরের বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, ছেলের ঘরে আলো জ্বলছে। দরজার কাছে গিয়ে ডাকতেই আশুতোষ দরজা খুলে দিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ অবাক বিস্ময়ে দেখলেন

যে সেই গভীর রাতে ছেলে পড়ছে—প্রদীপের সামনে রাশি রাশি বই খাতা ছড়ানো।
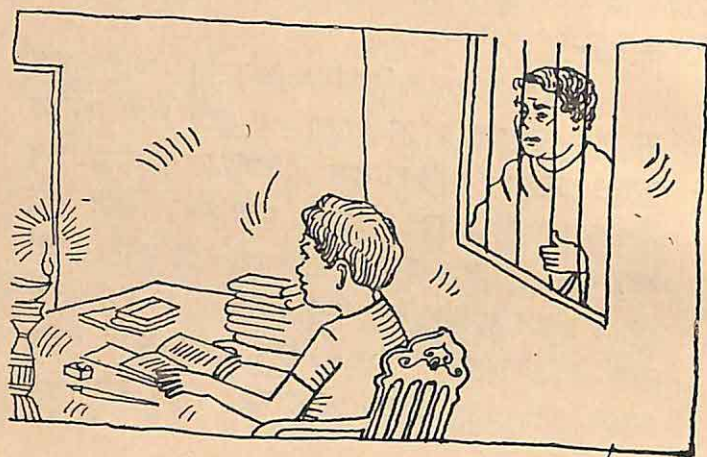
হাতেনাতে ধরা পড়লেন আশুতোষ

ছেলেকে গঙ্গাপ্রসাদ কোন কড়া কথা বললেন না, কারণ ছেলে আগেই পিতার আদেশ পালন না করার জন্যে লজ্জিত হয়েছিলেন। তিনি শুধু আশুতোষকে এই বলে সেদিন সতর্ক করে দিলেন যে—প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করলে প্রকৃতিই শাস্তি দেন। সেদিন সাবধান করলেও গঙ্গাপ্রসাদ এর পর ঘন ঘন অনুসন্ধান করতেন—ছেলে রাত জেগে পড়াশুনা করছে কিনা।

জানুয়ারি মাসে গঙ্গাপ্রসাদ আশুতোষের রাতজাগার ব্যাপার জানতে পারলেন। আর মার্চ মাস থেকেই আশুতোষ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মস্তিষ্কের অসুখ। অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় আশুতোষ শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। গঙ্গাপ্রসাদ হলেন চিন্তিত। নিজেই তিনি ছেলের চিকিৎসা করতে লাগলেন; কিন্তু কিছুতেই উপকার হলো না। বরং নতুন এক উপসর্গ সৃষ্টি হলো। তা হচ্ছে মাঝে মাঝে যন্ত্রণার জন্যে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। গঙ্গাপ্রসাদ এতে আরও চিন্তিত হলেন। তিনি আশুতোষকে কিছুকালের জন্যে হাওয়া বদলানোর উদ্দেশ্যে পাঠালেন গাজীপুরে।

গাজীপুরে থাকতেন আশুতোষের জ্যাঠামশাই দুর্গাপ্রসাদ। তিনি ছিলেন ওখানকার ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার। তাঁর কাছে থেকে আশুতোষের চিকিৎসা চলতে লাগলো। জুন মাসের শেষে এখানে এসেছিলেন আশুতোষ, আর জুলাই মাসে অসুখ তাঁর আরও বাড়লো। রোজই প্রায় আধ ঘণ্টা যাবৎ অচৈতন্য হয়ে থাকতেন। মাসখানেক এমনি চললো। জুলাইয়ের শেষে বৃষ্টি হলো—গরম একটু কমলো। আশুতোষ একটু সুস্থ বোধ করলেন। ভোরে উঠে বেড়ানো শুরু করলেন।

তোমরা বোধহয় জান, যে গাজীপুর জায়গাটি গোলাপ জল ও গোলাপের আতরের জন্যে বিখ্যাত। শহরে বড় বড় গোলাপ বাগান আছে। আশুতোষ প্রায়ই এই সব গোলাপ বাগানের কাছে বেড়াতে আসতেন। ফুলের সৌন্দর্য, মধুর সৌরভ তাঁকে মুগ্ধ করতো।

এই সময় একদিন একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। গাজীপুরে দুর্গাপ্রসাদবাবুর বাড়ির কাছে একটি ইঁদারা ছিল। ইঁদারার পাশে একটি গাছে ছিল ভীমরুলের চাক। একদিন আশুতোষ ঐ ইঁদারার পাড়ে বসে স্নান করছেন। এমন সময় পেছন থেকে একটি দুষ্টু ছেলে ঐ ভীমরুলের চাকে লাঠি মারে। মেরেই পালায়। ক্রুদ্ধ ভীমরুলেরা আসল দুষ্কৃতকারীকে খুঁজে না পেয়ে ইঁদারার পাশে উপবিষ্ট আশুতোষকে ভীষণ ভাবে কামড়ায়। আশুতোষ যন্ত্রণার চোটে অজ্ঞান হয়ে যান। সৌভাগ্যবশতঃ বাড়ির এক চাকর এ দৃশ্যটি দেখতে পায় এবং আরেকজনের সহায়তায় আশুতোষকে ধরাধরি করে বাসায় নিয়ে আসে।

পুরো একটি দিন আশুতোষ অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। জ্ঞান হওয়ার পর তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মাথার যন্ত্রণা আর একটুও অনুভব করলেন না। এতদিন ধরে এত চিকিৎসায় যে রোগ নিরাময় সম্ভব হচ্ছিল না—ভীমরুলের কামড়ে সে রোগ নিরাময় হলো।

এ কাহিনী শুনে অনেক বিজ্ঞ ডাক্তার বলেছিলেন যে, 'বিষে বিষক্ষয় হয়েছে। ভীমরুলের বিষ ব্যাধির বিষকে নষ্ট করেছে।'

আরও কিছুদিন গাজীপুরে থেকে অগস্ট মাসের শেষে আশুতোষ কলকাতায় ফিরে এলেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ।

নভেম্বর মাসে এফ. এ. পরীক্ষা শুরু হবে। ছ' মাস তো মোটেই পড়া হয় নি। এখন আশুতোষ একটু-আধটু পড়া আরম্ভ করলেন। একটু যেই পরিশ্রম করলেন অমনি আবার অসুখে পড়লেন। এবার জ্বর হলো—টাইফয়েড। বেশ কিছুদিন ভুগে আবার সেরে উঠলেন আশুতোষ। কিন্তু তাঁর ডান হাতটি কেমন যেন অবশ হয়ে রইলো।

আশুতোষ এবার জেদ ধরলেন—এফ. এ. পরীক্ষা দেবেন। সবাই একবাক্যে তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন। বললেন ঃ

> সে কি কথা, তুমি এখন দুর্বল। এই দুর্বল অবস্থায় পরীক্ষার জন্যে খাটলে ফের অসুখে পড়বে যে। তা ছাড়া ছ' সাত মাস ধরে একটুও পড়তে পারোনি। এ অবস্থায় পরীক্ষা দিলে তো ভাল ফল হবে না !

কিন্তু আশুতোষের জেদ—পরীক্ষা তিনি দেবেনই। গঙ্গাপ্রসাদকে অগত্যা মত দিতেই হলো।

এফ. এ. পরীক্ষা শুরু হলো। আশুতোষ একটানা বেশিক্ষণ লিখতে পারতেন না। কয়েক ঘণ্টা লিখলেই তাঁর হাত অবশ হয়ে আসতো। গঙ্গাপ্রসাদের তা জানা ছিল। তিনি রোজ টিফিনের সময় পরীক্ষাগৃহে যেতেন। সঙ্গে নিয়ে যেতেন ইলেকট্রিক ব্যাটারি। ছেলের হাতে ব্যাটারি লাগিয়ে বিদ্যুতের শক লাগাতেন। এতে কিছুটা উপকার হতো। আবার কয়েক ঘণ্টা আশুতোষ লিখতে পারতেন। এমনিভাবে অতি কষ্টে কোনমতে আশুতোষ পরীক্ষা তো দিলেন।

মাসখানেক বাদেই পরীক্ষার ফল বেরুবে। কিন্তু ফলের জন্যে আশুতোষ কেন—বাড়ির কেউই তেমন আগ্রহ দেখালেন না। কারণ সবারই ধারণা—আশুর পরীক্ষার ফল ভাল হতে পারে না।

কিন্তু পরীক্ষার ফল যখন বেরুলো তখন সবাই অবাক হয়ে গেলেন। প্রথম হতে পারেন নি, তবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন আশুতোষ। যে ছাত্র বছরের অধিকাংশ সময়ই অসুস্থ ছিলেন, ডান হাতটি দুর্বল থাকার জন্যে যিনি ভালভাবে লিখতে পারতেন না—তাঁর পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

১৮৮১ সালে আশুতোষ এফ. এ. পাশ করলেন—বৃত্তি পেলেন মাসিক পঁচিশ টাকা করে। এই সময় আশুতোষ উপলব্ধি করলেন যে তাঁর শরীর দিন দিন যেন ব্যাধির মন্দিরে পরিণত হচ্ছে। আজ বুক ধড়ফড়ানি, কাল মাথার যন্ত্রণা, পরশু টাইফয়েড—রোগ যেন তাঁর নিত্য সহচর হয়েছে। পিতার উপদেশগুলি তখন মনে পড়লো ঃ প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করলে প্রকৃতিই শাস্তি দেন।

আশুতোষ এইবার সতর্ক হলেন। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিলেন। মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেন। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই ব্যায়াম করতে লাগলেন। এতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে লাগলো।

আশুতোষের গড়নটা ছিল বেশ মোটাসোটা। মোটাসোটা হলেই যে স্বাস্থ্যবান হওয়া যায়—এ ধারণা ভুল। আশুতোষ এ কথা এখন বুঝলেন। বুঝলেন—তাঁর দুর্জয় মানসিক শ্রমভার বহন করবার উপযোগী তাঁর দেহের কাঠামো নয়। ব্যায়াম ক'রে শরীরটাকে তাই শক্ত করা দরকার। তিনি তা করতেও লাগলেন।

বিশ বছর আশুতোষ মাছ-মাংস স্পর্শ করেন নি। পরে ১৯০০ সালে আর একবার তিনি আমিষ খাদ্য খেয়েছিলেন। তবে তা রসনা পরিতৃপ্তির জন্যে নয়। ডাক্তারের পরামর্শে—শারীরিক কারণে।

পাঁচ

তখনকার দিনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. পরীক্ষার চলন ছিল কিন্তু বি. এস-সি. বলে কোন পরীক্ষা ছিল না। বি. এ. পরীক্ষাই দুটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। 'এ' কোর্স আর 'বি' কোর্স। 'এ' কোর্সের পাঠ্য বিষয় ছিল ইতিহাস, দর্শন, গণিত, অতিরিক্ত গণিত, সংস্কৃত ও ইংরেজী। এর মধ্যে ইংরেজী ও গণিত ছিল অবশ্য পাঠ্য। আর বাকি বিষয়গুলির মধ্যে ইচ্ছামত যে-কোন তিনটি বিষয় নেওয়া চলতো। 'এ' কোর্সের পাঠ্য বিষয় ছিল মোট পাঁচটি। দু'টি আবশ্যিক আর তিনটি ঐচ্ছিক।

'বি. এ.'র 'বি' কোর্সে মাত্র চারটি বিষয় পড়তে হতো। 'এ' কোর্সের মতই ইংরেজী ও গণিত ছিল আবশ্যিক বিষয়। আর পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা ও প্রাকৃতিক ভূগোলের মধ্যে যে-কোন দু'টি বিষয় ইচ্ছামত নেওয়া চলতো।

বেশীর ভাগ ছাত্রই 'এ' কোর্সের চাইতে 'বি' কোর্সটাকে বেশি পছন্দ করতেন। কারণ 'বি' কোর্সে বিজ্ঞানের বিষয়গুলি আছে। ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতের চেয়ে এই বিষয়গুলিতে বেশি নম্বর পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ 'বি' কোর্সে 'এ' কোর্সের চেয়ে একটি বিষয় কম পড়তে হয়। 'বি' কোর্সের ছাত্রেরাই বি. এ. পরীক্ষায় সাধারণতঃ প্রথম স্থান অধিকার করতেন। অবশ্য ব্যতিক্রম যে ছিল না, তা নয়। সে কথা পরে বলছি।

'কঠিন বিষয়কে আয়ত্ত করতে হবে'—আশুতোষের এ জেদ ছিল ছেলেবেলা থেকেই। তাই বি. এ.-তে 'বি' কোর্সের চেয়ে 'এ' কোর্সকেই তিনি বেশী পছন্দ করলেন। ১৮৮২ সালে তিনি বি. এ.'র 'এ' কোর্সের ছাত্র হিসাবে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন। এণ্ট্রান্স এবং এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করতে না পেরে আশুতোষের মনে ক্ষোভ সঞ্চিত ছিল। এখন স্বাস্থ্যও ভাল। তাই উঠে

পড়ে লাগলেন—যাতে বি. এ. পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করতে পারেন।

বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হওয়ার এক মাসের মধ্যেই আশুতোষ ইংরেজী পাঠ্য বইগুলি সব পড়ে ফেল্লেন। পরে অধ্যাপকেরা যখন ইংরেজী পড়ালেন তখন তাঁর পক্ষে বুঝতে খুব সুবিধা হলো।

বুথ সাহেব তখনও গণিতের অধ্যাপক। আশুতোষকে তিনি তো আগে থাকতেই ভালবাসতেন। এখন তিনি এই ছাত্রকে মনের মত করে পড়াতে লাগলেন। দু'বছরের মধ্যে বি. এ.'র গণিত শেষ করে এম. এ.'র গণিতেরও অধিকাংশ আশুতোষ আয়ত্ত ক'রে ফেল্লেন।

আশুতোষ শুধু উচ্চতর গণিত পড়েই ক্ষান্ত হলেন না। গণিতের মৌলিক তথ্যানুসন্ধানেও প্রবৃত্ত হলেন। আগেই বলেছি যে প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরীতে তখন বহু বিদেশী পত্র-পত্রিকা আসতো। তার মধ্যে একখানির নাম ছিল 'এডুকেশন্যাল টাইমস'। এই পত্রিকায় ইউরোপের বিখ্যাত পণ্ডিতেরা নানা রকম গাণিতিক সমস্যার অবতারণা করতেন। যিনি পারতেন ঐ সব সমস্যার সমাধান করতে, তা ঐ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হতো।

পত্রিকাখানি পড়ে আশুতোষ মুগ্ধ হলেন। তাঁরও ইচ্ছা হলো ঐ পত্রিকায় তিনি লেখেন। শীঘ্রই তাঁর ইচ্ছা পূরণ হয়। ১৮৮৩ সালে উচ্চতর গণিতের ওপর লেখা তাঁর একটি মৌলিক প্রবন্ধ বিলাতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এফ. এ. ক্লাসের সেই সরল মানুষ আশুতোষ এখনও সরল মানুষই আছেন। চাল-চলনে সরল, পোষাক-পরিচ্ছদে সরল। ধুতি আর চাদর। এই ধুতি আর চাদর পরে একদিন কি বিপদ ঘটেছিল তা শোন।

আশুতোষ তখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। ধুতি চাদর পরে ট্রামে করে চলেছেন। ট্রাম থেকে নামবার সময় হঠাৎ গায়ের চাদরখানা ট্রামের হাতলে জড়িয়ে গিয়ে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। বেশ আঘাত পেলেন। তাতে বেশ শিক্ষা হলো আশুতোষের।

সেইদিন থেকে আশুতোষ প্রতিজ্ঞা করলেন—চাদর আর কোনদিন ব্যবহার করবেন না।

সরল মানুষ আশুতোষের এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনে তাঁর বন্ধুরা বেশ মজা অনুভব করলেন। পরের দিন তাঁরা কলেজ বসবার অনেক আগে এসে গেটের সামনে দাঁড়ালেন।

ঘড় ঘড় করতে করতে একখানি ট্রাম এসে প্রেসিডেন্সী কলেজের সামনের স্টপে থামলো। আশুতোষ নামলেন ঐ ট্রাম থেকে। সত্যিই তো চাদর নেই গায়ে! বন্ধুর দল তাই না দেখে রসিকতা করে হাততালি দিয়ে উঠলেন। কিন্তু আশুতোষ তাতে একটুও অপ্রতিভ হলেন না। সংকল্পে তিনি অটল রইলেন। চাদর আর ব্যবহার করলেন না গোটা ছাত্রজীবনে।
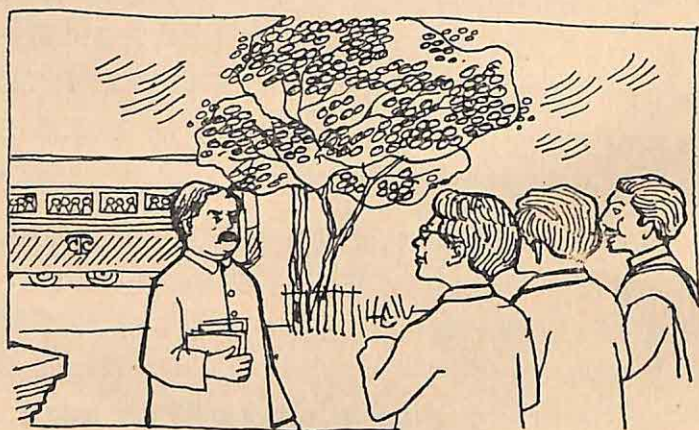
বিনা চাদরে আশুতোষ এলেন কলেজে

প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরী দেখে আশুতোষ গোড়াতেই মুগ্ধ হয়েছিলেন—একথা তোমাদের আগেই বলেছি। এখন তাঁর ইচ্ছা হলো অমন একটি ভাল লাইব্রেরী নিজের বাড়িতেই স্থাপন করবেন। পুত্রের এ ইচ্ছাপূরণের জন্যে গঙ্গাপ্রসাদও অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করলেন না।

দেখতে দেখতে আশুতোষের লাইব্রেরীতে প্রায় পনর হাজার টাকার মহামূল্য বই ও পত্র-পত্রিকা জমে গেল। খুশি হলেন পুত্র; খুশি হলেন পিতা। আর একটি কারণেও পিতা এবার খুশি হলেন। তিনি দেখলেন—আশুতোষ আর রাত জেগে লেখাপড়া করেন না। তাছাড়া নিয়মিত ব্যায়াম ও প্রাতর্ভ্রমণও করেন।

শরীর চর্চা ক'রে ফল ভালই হলো। বি. এ. পড়বার সময় আশুতোষের আর অসুখ হয় নি। যতটুকু সময় দরকার—বেশ মন দিয়েই পড়তে পেরেছিলেন।

দেখতে দেখতে বি. এ. পরীক্ষার দিন এগিয়ে এলো। যথা সময়ে পরীক্ষা দিলেন আশুতোষ। সেটা ১৮৮৪ সালের জানুয়ারি মাস। পরের মাসে ফল বেরুলো। আশুতোষ এবার আগেকার সব অসাফল্যের গ্লানি দূর করেছেন। প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

'এ' কোর্সে পরীক্ষা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করা কম কৃতিত্বের বিষয় নয়। এর আগে একজন মাত্র 'এ' কোর্সে বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে প্রথম হয়েছিলেন। তবে আশুতোষ তাঁর চেয়েও মোট ৬০ নম্বর বেশি পেয়ে কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এই পরীক্ষায় দর্শন-শাস্ত্রে আশুতোষ কত পেয়েছিলেন জান? ১০০র মধ্যে ৯৬!

সে যুগে বোম্বাই শহরে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ নামে এক বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৮৬৬ সালে তিনি ভারত সরকারের হাতে দু' লক্ষ টাকা দান ক'রে যান। শর্ত ছিল—ঐ টাকায় যেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কল্যাণমূলক কাজ হয়।

তখনকার দিনে দু' লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজে বছরে দশ হাজার টাকা সুদ পাওয়া যেত। ঐ টাকায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক পরীক্ষার সৃষ্টি করলেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা—নাম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষা। স্থির হলো এম. এ. পাশ করার পর এই পরীক্ষা দেওয়া যাবে। যিনি এই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করবেন তাঁকে দশ হাজার টাকা বৃত্তি দেওয়া হবে

এইভাবে এতদিন এ পরীক্ষা হয়ে আসছিল। কিন্তু ১৮৮৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ পরীক্ষা উঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত করলেন। সেই টাকায় উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিলাতে ছাত্র পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

আশুতোষ তখন বি. এ. ক্লাশের ছাত্র। এ খবর শুনে আশুতোষ মনে খুব ব্যথা পেলেন। কারণ শৈশবকাল থেকেই এই বৃত্তি লাভের স্বপ্ন তিনি দেখতেন। যাই হোক আশুতোষ সহজে দমবার পাত্র ছিলেন না। তিনি এই পরীক্ষা সংস্কার সম্পর্কে একখানি পুস্তিকা নিজের খরচে ছাপিয়ে প্রচার করলেন। পুস্তিকায় ছদ্মনাম ব্যবহার করলেন 'Nebeos'।

ঐ পুস্তিকায় আশুতোষ যা লিখেছিলেন তার সারমর্ম হচ্ছে এইঃ সব ব্যাপারে পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে থাকা সঙ্গত নয়। যে ছাত্র বিলাতে পড়তে যাবেন, তিনি যে মহাপণ্ডিত হয়ে ফিরে আসবেন, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অপর পক্ষে দেশে থেকেই লেখাপড়া করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ ক'রে বহু ছাত্রই তো মহাপণ্ডিত আখ্যা লাভ করেছেন—যশস্বী হয়েছেন। তা হ'লে বিদেশে বহু টাকা খরচ ক'রে ছাত্র পাঠাবার প্রয়োজন কি? তার বদলে স্বদেশের বিশ্ববিদ্যালয়েই উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা করা উচিত নয় কি?

অকাট্য যুক্তি। সিণ্ডিকেটের সভ্যেরা এ যুক্তি অস্বীকার করতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে তাঁরা নিজেদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার ক'রে নিলেন। আশুতোষও খুশি হলেন।

আশুতোষের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ.'র এক মাস পরেই এম. এ. পরীক্ষা হতো। জানুয়ারি মাসে বি. এ. আর ফেব্রুয়ারিতে এম. এ.। আশুতোষের ইচ্ছা ছিল বি. এ. পরীক্ষা দিয়েই পরের মাসে ইংরেজীতে এম. এ. পরীক্ষায় বসবেন। সাধারণ ছাত্রের কাছে এটা অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হলেও আশুতোষের মত প্রতিভাবান ছাত্রের কাছে এটা মোটেই অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তাঁর এ ইচ্ছায় বাদ সাধলেন ইংরেজীর অধ্যাপক রো সাহেব।

রো সাহেব এ খবর জানতে পেরে আশুতোষকে সতর্ক করে দিলেন। বল্লেন ঃ এতে উভয় পরীক্ষাতেই তোমার ভাল ফল না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। তোমার মত ছাত্র যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার শীর্ষস্থান অধিকার করতে না পারে, তাহলে আমি কেন, কোন অধ্যাপক খুশী হতে পারবেন না। আর তুমি তো নয়ই।

রো সাহেবের সতর্কবাণী শুনে আশুতোষ মত বদলালেন। পরের মাসে এম. এ. পরীক্ষা দেওয়ার সংকল্প ত্যাগ করলেন। বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে আশুতোষ বুঝতে পারলেন যে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মশাই তাঁকে সতর্ক ক'রে দিয়ে ভালই করেছিলেন।

সে বছর বি. এ.'র গণিতে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্যে আশুতোষ 'হরিশচন্দ্র পুরস্কার' ও দেড়শো টাকার বৃত্তি পেয়েছিলেন।

১৮৮৪ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পরীক্ষার সময় পিছিয়ে দেওয়া হলো। ফেব্রুয়ারি থেকে নভেম্বর করা হলো।

ছয়

প্রথমবার ইংরেজীতে এম. এ. পরীক্ষা দিতে গিয়ে আশুতোষ অধ্যাপক রো সাহেবের কাছ থেকে বাধা পেয়েছিলেন। আবার বি. এ.'তে গণিতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে তিনি যথেষ্ট উৎসাহিত হয়েছিলেন। এই দুই কারণে ইংরেজীর বদলে অশুতোষ গণিতে এম. এ. দেওয়া স্থির করলেন। সেই অনুসারে ১৮৮৫ সালেই তিনি গণিতে এম. এ. পরীক্ষা দিলেন। বলা বাহুল্য আগের মতই প্রথম স্থান অধিকার ক'রে সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখলেন।

পরের বছর ১৮৮৬ সালে আশুতোষ দু'টি পরীক্ষার জন্যে তৈরি হতে লাগলেন। একটি হচ্ছে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষা, আরেকটি হচ্ছে বিজ্ঞানে এম. এ. পরীক্ষা। ইতিমধ্যে প্রথমবার গণিতে এম. এ.

পাশ করেই আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষার গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হবার জন্যে দরখাস্ত করেছিলেন। কিন্তু অল্পবয়স ও অনভিজ্ঞ বলে তাঁকে পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়নি। এজন্যে আশুতোষের মনে ক্ষোভ ছিল।

এতদিন পর্যন্ত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষায় পাঁচটি বিষয়ের পরীক্ষা দিতে হতো। ১৮৮৬ সালে সেই নিয়মের সংশোধন হলো। স্থির হলো—এক বছর সাহিত্য বিষয়ে, আর এক বছর বিজ্ঞান বিষয়ে এই পরীক্ষা গৃহীত হবে। আর পাঠ্য বিষয় থাকবে মাত্র তিনটি। আশুতোষ বিশুদ্ধ গণিত, মিশ্র গণিত ও বিজ্ঞান—এই তিন বিষয় নিয়ে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা দেবেন। আর বিজ্ঞানে এম. এ. পরীক্ষা দেবেন—বিশুদ্ধ গণিত, মিশ্র গণিত ও পদার্থবিদ্যা নিয়ে। এই স্থির হলো।

আশুতোষ এই সময় প্রেসিডেন্সী কলেজের ল্যাবরেটরীতে প্রায় সারা দিনই কাজ করে বিজ্ঞানের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। ল্যাবরেটরীতে তাঁর কাজের সময় ছিল ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত। বাড়ীতে বসে গণিতের অনুশীলন করতেন।

এই সময় ম্যাক্সওয়েল সাহেবের লেখা বিদ্যুৎ-বিষয়ক একখানি বই আশুতোষের হস্তগত হয়। তিনি মন দিয়ে সেটি পড়া আরম্ভ করেন। কিন্তু পড়তে গিয়ে দেখেন যে তার মধ্যে প্রচুর কঠিন অঙ্ক রয়েছে। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সাধারণ কোন ছাত্র হলে বইখানি হয়তো বন্ধ করে রাখতেন। কিন্তু আশুতোষের স্বভাব তেমন ছিল না। অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় কোন কাজ তিনি ফেলে রাখতেন না। পিতার উপদেশ ঃ 'ভাল করে শেখা চাই'—সর্বদা মনে রাখতেন। আর এই উপদেশই তাঁকে উন্নতির চরম শিখরে উঠতে সাহায্য করেছিল। তাই আশুতোষেরও জেদ হলো—বইখানিকে পড়ে আয়ত্ত করতেই হবে। কিন্তু কি উপায়ে?

আশুতোষ গেলেন অধ্যাপক ইলিয়ট সাহেবের কাছে। তাঁকে সব খুলে বল্লেন। সব শুনে অধ্যাপক মশাই বল্লেন ঃ দেখ আশুতোষ,

আমি ঐ বইখানি পড়িনি। আমি যখন কেম্ব্রিজে পড়ি তখন এ বইটি প্রকাশিত হয় নি। এখন তো আমার পক্ষে এ বই পড়ানো সম্ভব হবে না।

আশুতোষ একটু দমলেন কিন্তু নিরাশ হলেন না। তিনি জানতে পারলেন যে বইখানি সত্যিই খুব কঠিন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েই মাত্র দু-তিন জন অধ্যাপক আছেন যাঁরা ঐ দুরূহ বইখানি পড়াতে পারেন। কেম্ব্রিজের অধ্যাপক কেলির কাছ থেকে এ খবর জেনেও আশুতোষ হতাশ হলেন না। দুর্দণ্ড জেদ নিয়ে তিনি নিজেই বইখানি আবার পড়তে সুরু করলেন। এই সময় ঐ বইয়ের এক কপি ফরাসী অনুবাদ তাঁর হস্তগত হয়। আর ফরাসী ভাষা তিনি আগেই শিখেছিলেন। কাজেই ঐ দুরূহ বইখানিকে আয়ত্ত করতে এবার আর তাঁকে মোটেই বেগ পেতে হলো না।

যাই হোক পূর্ব সংকল্প অনুযায়ী আশুতোষ সে বছর বিজ্ঞানে এম. এ. এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরাক্ষা দিলেন। উভয় পরীক্ষাতেই কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন। এম.এ.-তে হলেন প্রথম। 'মোয়াট' পদক পেলেন। আর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেলেন দশহাজার টাকার।

এইবার আশুতোষ সরাসরি এম.এ পরীক্ষার গণিতের পরীক্ষক হবার জন্যে আবেদন করলেন। এ জগতে সমালোচকের অভাব নেই। কাজেই অনেক সমালোচক আশুতোষের সমালোচনা করলেন। এবারও সেই পুরনো কথা—বয়স কম, অভিজ্ঞতা কম ইত্যাদি। এবার কিন্তু কোন সমালোচনাই ধোপে টিকলো না। সিণ্ডিকেট সদস্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও দু'জনার চেষ্টায় তাঁর সাধ পূর্ণ হলো। ১৮৮৭ সালের মার্চ মাসে আশুতোষ পরীক্ষকের নিয়োগ পত্র পেলেন। তিনি এম.এ.'র প্রথম বাঙ্গালী পরীক্ষক হলেন। আগে সংস্কৃত, আরবী, পারসী প্রভৃতি বিষয়েই শুধু দেশীয় লোকেরা পরীক্ষক হতেন।

আশুতোষের উচ্চাভিলাষের অন্ত ছিল না। ১৮৮৭ সালে আবার কোন বিষয়ে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষা দেবার ইচ্ছা হলো

পাশ করেই আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষার গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হবার জন্যে দরখাস্ত করেছিলেন। কিন্তু অল্পবয়স ও অনভিজ্ঞ বলে তাঁকে পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়নি। এজন্যে আশুতোষের মনে ক্ষোভ ছিল।

এতদিন পর্যন্ত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষায় পাঁচটি বিষয়ের পরীক্ষা দিতে হতো। ১৮৮৬ সালে সেই নিয়মের সংশোধন হলো। স্থির হলো—এক বছর সাহিত্য বিষয়ে, আর এক বছর বিজ্ঞান বিষয়ে এই পরীক্ষা গৃহীত হবে। আর পাঠ্য বিষয় থাকবে মাত্র তিনটি। আশুতোষ বিশুদ্ধ গণিত, মিশ্র গণিত ও বিজ্ঞান—এই তিন বিষয় নিয়ে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা দেবেন। আর বিজ্ঞানে এম. এ. পরীক্ষা দেবেন—বিশুদ্ধ গণিত, মিশ্র গণিত ও পদার্থবিদ্যা নিয়ে। এই স্থির হলো।

আশুতোষ এই সময় প্রেসিডেন্সী কলেজের ল্যাবরেটরীতে প্রায় সারা দিনই কাজ করে বিজ্ঞানের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। ল্যাবরেটরীতে তাঁর কাজের সময় ছিল ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত। বাড়ীতে বসে গণিতের অনুশীলন করতেন।

এই সময় ম্যাক্সওয়েল সাহেবের লেখা বিদ্যুৎ-বিষয়ক একখানি বই আশুতোষের হস্তগত হয়। তিনি মন দিয়ে সেটি পড়া আরম্ভ করেন। কিন্তু পড়তে গিয়ে দেখেন যে তার মধ্যে প্রচুর কঠিন অঙ্ক রয়েছে। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সাধারণ কোন ছাত্র হলে বইখানি হয়তো বন্ধ করে রাখতেন। কিন্তু আশুতোষের স্বভাব তেমন ছিল না। অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় কোন কাজ তিনি ফেলে রাখতেন না। পিতার উপদেশ ঃ 'ভাল করে শেখা চাই'—সর্বদা মনে রাখতেন। আর এই উপদেশই তাঁকে উন্নতির চরম শিখরে উঠতে সাহায্য করেছিল। তাই আশুতোষেরও জেদ হলো—বইখানিকে পড়ে আয়ত্ত করতেই হবে। কিন্তু কি উপায়ে?

আশুতোষ গেলেন অধ্যাপক ইলিয়ট সাহেবের কাছে। তাঁকে সব খুলে বল্লেন। সব শুনে অধ্যাপক মশাই বল্লেন ঃ দেখ আশুতোষ,

আমি ঐ বইখানি পড়িনি। আমি যখন কেম্ব্রিজে পড়ি তখন এ বইটি প্রকাশিত হয় নি। এখন তো আমার পক্ষে এ বই পড়ানো সম্ভব হবে না।

আশুতোষ একটু দমলেন কিন্তু নিরাশ হলেন না। তিনি জানতে পারলেন যে বইখানি সত্যিই খুব কঠিন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েই মাত্র দু-তিন জন অধ্যাপক আছেন যাঁরা ঐ দুরূহ বইখানি পড়াতে পারেন। কেম্ব্রিজের অধ্যাপক কেলির কাছ থেকে এ খবর জেনেও আশুতোষ হতাশ হলেন না। দুর্দণ্ড জেদ নিয়ে তিনি নিজেই বইখানি আবার পড়তে সুরু করলেন। এই সময় ঐ বইয়ের এক কপি ফরাসী অনুবাদ তাঁর হস্তগত হয়। আর ফরাসী ভাষা তিনি আগেই শিখেছিলেন। কাজেই ঐ দুরূহ বইখানিকে আয়ত্ত করতে এবার আর তাঁকে মোটেই বেগ পেতে হলো না।

যাই হোক পূর্ব সংকল্প অনুযায়ী আশুতোষ সে বছর বিজ্ঞানে এম. এ. এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরাক্ষা দিলেন। উভয় পরীক্ষাতেই কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন। এম.এ.-তে হলেন প্রথম। 'মোয়াট' পদক পেলেন। আর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেলেন দশহাজার টাকার।

এইবার আশুতোষ সরাসরি এম.এ পরীক্ষার গণিতের পরীক্ষক হবার জন্যে আবেদন করলেন। এ জগতে সমালোচকের অভাব নেই। কাজেই অনেক সমালোচক আশুতোষের সমালোচনা করলেন। এবারও সেই পুরনো কথা—বয়স কম, অভিজ্ঞতা কম ইত্যাদি। এবার কিন্তু কোন সমালোচনাই ধোপে টিকলো না। সিণ্ডিকেট সদস্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও দু'জনার চেষ্টায় তাঁর সাধ পূর্ণ হলো। ১৮৮৭ সালের মার্চ মাসে আশুতোষ পরীক্ষকের নিয়োগ পত্র পেলেন। তিনি এম.এ.'র প্রথম বাঙ্গালী পরীক্ষক হলেন। আগে সংস্কৃত, আরবী, পারসী প্রভৃতি বিষয়েই শুধু দেশীয় লোকেরা পরীক্ষক হতেন।

আশুতোষের উচ্চাভিলাষের অন্ত ছিল না। ১৮৮৭ সালে আবার কোন বিষয়ে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষা দেবার ইচ্ছা হলো

তাঁর। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনও করলেন। কিন্তু সে আবেদন মঞ্জুর হলো না। কর্তৃপক্ষ বল্লেন ঃ বার বার একই ছাত্রের এ পরীক্ষা দেওয়া নিয়ম বিরুদ্ধ। তা ছাড়া তাতে অন্যান্য ভাল ছাত্রদের প্রতি অবিচারও করা হয়।

আশুতোষ কিন্তু নিরস্ত হলেন না। ইতিমধ্যে বি. এ. পাশ করার পর থেকেই তিনি সিটি কলেজে আইন পড়ছিলেন। এম. এ. ও আইন একই সঙ্গে পড়ছিলেন। আইনের ছাত্র হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল।

তখনকার দিনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক'-এর একটি পদ ছিল। প্রতি বছর দেশ-বিদেশের বিখ্যাত আইনজ্ঞরা ঐ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বক্তৃতা দিতেন। ছাত্রদের সেই বক্তৃতা শুনতে হতো এবং পরে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে হতো। ১৮৮৪ থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত আইনের প্রতিটি প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় আশুতোষ প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণ-পদক পেয়েছিলেন। অধ্যাপক আমীর আলী, অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রমুখ বিখ্যাত আইন অধ্যাপকেরা আইন শাস্ত্রে আশুতোষের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। যাই হোক আইনের এ হেন প্রতিভাধর ছাত্রটি ১৮৮৮ সালে সিটি কলেজ থেকে বি. এল. পাশ করে ওকালতির সনদ পান।

আগেই বলেছি যে বিলাতের কয়েকটি পত্রিকায় গণিত সম্পর্কে আশুতোষের কতকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। শুধু তাই নয়, তাঁর দুটি প্রবন্ধ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যও হয়েছিল। কাজেই বিলাতের পণ্ডিত সমাজে আশুতোষ সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। তারই ফল স্বরূপ ১৮৮৫ সালে আশুতোষকে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য করে নেওয়া হয়। পরের বছর তিনি এডিনবরার রয়্যাল সোসাইটিরও সভ্য মনোনীত হন। আশুতোষের আগে আর কোন বাঙালী এই সম্মান লাভ করেন নি।

ঐ সময় স্মৃতিশাস্ত্র পড়বার খুব ইচ্ছা হয় আশুতোষের। তখন

সংস্কৃত কলেজের মধুসূদন স্মৃতিরত্ন পণ্ডিতমশাইয়ের খুব নাম। এঁর কাছে আশুতোষ স্মৃতিশাস্ত্র পড়া শুরু করেন। কিছু কালের মধ্যেই মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, দায়ভাগ, মিতাক্ষরা, দণ্ডক চন্দ্রিকা প্রভৃতি পড়ে শেষ করে ফেলেন। তাতেও মন ভরে না। শেষে পণ্ডিত গয়ারাম স্মৃতিকণ্ঠকে বাড়িতে ডেকে এনে আরও পড়াশুনা করেন।

দেখ—কি বিভিন্নমুখী প্রতিভা ছিল আশুতোষের! আইন, গণিত, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে যিনি পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তাঁর পক্ষে সংস্কৃত সাহিত্যকে আয়ত্ত করা মোটেই কঠিন হলো না। বাংলার পণ্ডিত সমাজে শীঘ্রই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন।

তখনকার দিনে ভারতের যিনি সার্ভেয়ার জেনারেল ছিলেন, গণিতশাস্ত্রে তাঁর যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। ভদ্রলোক ১৮৮৭ সালে মারা যান। পরের বছর তাঁর লাইব্রেরীর বইগুলি নীলামে বিক্রি করা স্থির হয়। ঐ সব বইয়ের মধ্যে ফরাসী ভাষায় লেখা উচ্চতর গণিতের দু'খানি বই ছিল। ঐ বই দু'খানি কেনার উদ্দেশ্যে আশুতোষ নীলামওয়ালার দোকানে যান। নীলাম তখন সবে শুরু হয়েছে। এমন সময় কোথা থেকে এক সাহেব জুড়ি গাড়ীতে চড়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। সাহেব গাড়ী থেকে নেমে নীলামওয়ালাকে গুটি কয়েক কথা বলে ফের গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

কতকগুলি বই বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর গণিতের ঐ বই দু'খানির পালা এলো। চড়চড় করে বইখানির দাম উঠতে লাগলো। প্রথম বইখানির জন্যে আশুতোষ একশো টাকা পর্যন্ত দর তুললেন। কিন্তু নীলামওয়ালা তার ওপর আরও এক টাকা দর হেঁকে বইখানি আলাদা করে রেখে দিল। আশুতোষ একটু অবাক্ হলেন।

এবার দ্বিতীয় বইখানির পালা। আশুতোষ যে দর বলেন, নীলামওয়ালা তার ওপর বরাবরই এক টাকা বেশি দর হাঁকে। এবারে আশুতোষ দেড়শো টাকা পর্যন্ত ওঠেন। তাতেও কিছু লাভ হয় না। নীলামওয়ালা এক টাকা বেশি দর দিয়ে বইখানি কাছে রেখে দেয়। আশুতোষ এবার আরও অবাক্ হন।

নীলাম শেষে আশুতোষ নীলামওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ ব্যাপার কি মশাই ?

নীলামওয়ালা ঃ কিছুক্ষণ আগে জুড়ি গাড়িতে চড়ে যে সাহেব এসেছিলেন উনি বিচারপতি ওকেনেলি। উনি বলে গেলেন—যে দামই উঠুক না কেন গণিতের ঐ বই দু'খানি আমার চাইই। তাই আপনার দরের ওপরে বরাবরই আমাকে এক টাকা বেশি দর হাঁকতে হয়েছে। বই দু'খানি আমি ওকেনেলি সাহেবের জন্যে আলাদা করে রেখেছি।

সব শুনে আশুতোষ ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে এলেন।

এদিকে ওকেনেলি সাহেব তো বই দু'খানির জন্যে দু'শো বাহান্ন টাকার বিল পেয়ে অবাক্। এত দাম উঠবে তা তিনি কল্পনাও করেন নি। তখন নীলামওয়ালা সাহেবকে সব কথা খুলে বল্লেন।

বল্লেন ঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামে এক বাঙালী যুবক এত দাম তুলেছিলেন।

যাই হোক সাহেব তো বিলের টাকা শোধ করে বই দু'খানি কাছে রেখে দিলেন; আর ঐ যুবকের পরিচয় জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাই পরদিন হাইকোর্টে গিয়েই তিনি আশুতোষের খোঁজ নিলেন। ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ তখন কলকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল।

ওকেনেলি সাহেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যয় নামে কোন বাঙালী যুবককে আপনি চেনেন ?

রাসবিহারীবাবু বল্লেন ঃ বিলক্ষণ সে তো আমার কাছে শিক্ষানবিশ হয়ে আছে।

ওকেনেলি সাহেব ঃ যুবকটির সঙ্গে আমি আলাপ করতে চাই, মিস্টার ঘোষ।

রাসবিহারীবাবু ঃ বেশ তো, তাকে আমি খবর দিচ্ছি।

এই কথা বলে রাসবিহারীবাবু আশুতোষের সঙ্গে দেখা করে তার হাতে একখানি পরিচয়-পত্র লিখে দিলেন। ঐ পরিচয়-পত্র

নিয়ে আশুতোষকে তিনি ওকেনেলি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে বল্লেন।

আশুতোষ তাই করলেন। কিন্তু বিচারপতি ওকেনেলি ঐ পরিচয় পত্রখানি না পড়েই ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্লেন ঃ আপনার পরিচয়ের জন্যে কোন পরিচয়-পত্রের দরকার নেই। এই বই দু'খানিই আপনার যথেষ্ট পরিচয়।

এই কথা বলে বিচারপতি নীলাম থেকে কেনা গণিতের বই দু'খানি আশুতোষকে উপহার দিলেন। খুশী মনে আশুতোষ তা গ্রহণ করলেন।

সেই দিন থেকে বিচারপতি ওকেনেলি হলেন আশুতোষের পরম হিতৈষী বন্ধু।

সাত

১৮৮৮ সালে আশুতোষ ওকালতির সনদ পান। তার আগেই তিনি দুই বিষয়ে এম. এ. পাশ করেছিলেন এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়েছিলেন।

এই সময় বাংলা দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন স্যার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট। ক্রফ্‌ট সাহেব আশুতোষকে ডেকে পাঠান। আশুতোষ দেখা করতে গেলে ক্রফ্‌ট সাহেব বলেন ঃ

আপনি সরকারী চাকরি করবেন, আশুবাবু? প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতের অধ্যাপকের পদ খালি আছে। বেতন মাসিক আড়াইশো টাকা।

আশুতোষ ঃ ঐ সম্মানজনক পদ গ্রহণ করতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে দুইটি শর্তে আমি রাজি হতে পারি। প্রথমতঃ কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আমাকে অন্য কোথাও বদলী করা চলবে না। দ্বিতীয়তঃ মাত্র আড়াইশো টাকা বেতন আমি

গ্রহণ করব না। আমাকে বিলেত-ফেরত অধ্যাপকদের সমান বেতন হার দিতে হবে।

ক্রফ্‌ট সাহেব একটু বিরক্ত হয়ে বল্লেন: গভর্নমেণ্ট তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মচারীদের যেখানে খুশী বদলী করে থাকেন। এইটাই চিরন্তন রীতি। এ রীতি তো আর বদলানো যায় না। তবে হ্যাঁ, বেতনের ব্যাপারটা বিলাতে ভারত সচিব বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

আশুতোষ দৃপ্তকণ্ঠে বল্লেন: তবে চাই না আমি আড়াইশো টাকা বেতনের ঐ চাকরি।

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ক্রফ্‌ট সাহেব অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বল্লেন: তবে আপনি কি করতে ইচ্ছা করেন?

আশুতোষ: আমি হাইকোর্টে ওকালতি করব।

ক্রফ্‌ট সাহেব: হাইকোর্টে বহু বেকার উকিল আছেন। তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে আপনি কি গৌরবের অধিকারী হবেন?

ক্রফ্‌ট সাহেবের এই বিদ্রূপে আশুতোষের আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন—সংকল্পে অটুট থাকবেন, আর এই বিদ্রূপের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবেন।

সেই সময় কলকাতা হাইকোর্টে একজন বিখ্যাত উকিল ছিলেন। তাঁর নাম ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ। এঁর কথা তোমাদের আগেই বলেছি। ইনি আশুতোষের গুণে মুগ্ধ হয়ে আশুতোষকে নিজের সহকারী করে নেন। প্রখ্যাত এই আইনবিদের কাছে থেকে আশুতোষ হাতে-কলমে আইন ব্যবসা শিখতে থাকেন।

কিছুকাল শিক্ষানবীশ হয়ে কাজ করার পর আশুতোষ হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। আইন-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায় ও সর্বোপরি সুন্দর বক্তৃতা করার ক্ষমতা—এই তিন গুণের জন্যে উকিল হিসাবে শীঘ্রই আশুতোষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে থাকেন। মাসে তাঁর ছ'-সাত হাজার টাকা আয় হতে থাকে।

পাঁচ-ছ' বছর ওকালতি করার পর আশুতোষের ইচ্ছা হলো যে আইনের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিতে হবে। পড়াশুনা তো যথেষ্টই করা ছিল। তবুও আরও কিছু পড়ে নিয়ে তিনি আইনের অনার্স এবং ডক্টর অভ ল পরীক্ষা দিলেন। ১৮৯৩ সালে উভয় পরীক্ষাতেই তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করলেন।

এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক এলো। ডাক এলো ঠাকুর অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্যে। সে ডাকে আশুতোষ সাড়া দিলেন। ছাত্রাবস্থায় আশুতোষ এই ঠাকুর অধ্যাপকদের আইনের ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতেন। আর আজ সেই অধ্যাপক হিসাবেই তাঁকে দেখা গেল বক্তৃতায় বিভোর হয়ে যেতে। এ পদে বহাল থাকা কালে Law of Perpetuity সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

১৮৯৯ সাল।

আশুতোষের বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বছর মাত্র। এই অল্প বয়সেই তিনি অতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সে বছর তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। দু' বছর পরে আবার তিনি ঐ পদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কে কে ছিলেন জান? দেশবরেণ্য নেতা স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বাহাদুর। এই দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারানো যে কি শক্ত ব্যাপার তা অনুমান করতে পারছ। কিন্তু এই অসাধ্য সাধনই করেছিলেন আশুতোষ। দ্বিতীয়বার তিনি ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ক্রমে আইনশাস্ত্রে আশুতোষের পাণ্ডিত্য ও ওকালতিতে পসারের কথা ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জনের কানে পৌঁছলো। তিনি আশুতোষকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত করলেন। সেটা ১৯০৪ সালের কথা। আশুতোষ তাঁর মায়ের অনুমতি নিয়ে এই পদ গ্রহণ করলেন। বিচারপতির পদ অত্যন্ত সম্মানজনক, বেতনও খুব বেশী। কিন্তু সমাজ জীবনে আশুতোষের সম্মান তখন কম ছিল

না। আর অর্থ? তাও তিনি প্রচুর রোজগার করছিলেন। কাজেই বিচারপতি পদের অর্থ ও সম্মান আশুতোষকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি।

এই পদ গ্রহণের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল অন্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আশুতোষ অত্যন্ত ভালবাসতেন। হাইকোর্টে ওকালতি করার সময় অত্যধিক কাজের চাপে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করার অবসর পেতেন না। কিন্তু বিচারপতির পদ গ্রহণ করলে সে অবকাশ পাবেন—পাবেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সেবা করার সুযোগ। এই আশাতেই তিনি বিচারপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন। আর এই পদ গ্রহণ করে তিনি ক্রফ্‌ট সাহেবের বিদ্রূপাত্মক উক্তির সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন।

১৯০৪ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত আশুতোষ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার মধ্যে ১৯২০ সালে কয়েক মাসের জন্যে প্রধান বিচারপতির পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন।

প্রাচীন রোমান আমল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত আইনের বিকাশ ও তার বিরাট ইতিহাস আশুতোষের সম্পূর্ণ আয়ত্তে ছিল। প্রত্যেক দেশের আইন-কানুন ও বিচারপদ্ধতি তাঁর নখদর্পণে ছিল। আর বিচারপতি হিসাবে কয়েকটি বিখ্যাত মামলার তিনি যে রায় দিয়েছিলেন তা স্মৃতিশাস্ত্রের সম্পদ স্বরূপ।

আশুতোষ ছিলেন কর্মযোগী। অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। হাইকোর্টের জজ্‌ হিসাবেও তিনি যে কি রকম পরিশ্রম করতেন তা একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেই তোমরা বুঝতে পারবে।

কোনও এক বছর হাইকোর্টের তিনজন জজ্‌ মিলে মোট ৮০৩টি মামলার বিচার করেছিলেন। সেই মামলাগুলির মধ্যে ৮০০টি মামলার রায় আশুতোষ লিখেছিলেন নিজে। আর তিনটি মামলার রায় লিখেছিলেন বাকি দু'জন জজ্‌। এই বৈষম্যের কারণ জিজ্ঞাসা করায় আশুতোষ কি বলেছিলেন জান? বলেছিলেন: যে কাজ করবে, সে কাজ করবে; আর যে কাজ করবে না, সে কাজ করবে না।

এইটাই জগতের নিয়ম। তিনি আরও বলেছিলেন ঃ এমন দিন যদি সত্যিই আসে, যেদিন পরিশ্রম করতে না পেরে আমার অর্জিত প্রতিষ্ঠা নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে—তবে সেদিন আসবার আগেই আমি জজের পদ থেকে সরে যাব।

প্রধান বিচারপতির বেশে আশুতোষ (১৯২০)

এত বড় পণ্ডিত ও কর্মবীরের মধ্যে কিন্তু এতটুকু অহঙ্কার ছিল না। তিনি ছিলেন বিনয়ের অবতার। ১৯২৪ সালে বিচারপতির পদ থেকে অবসর নেবার সময় আশুতোষ বলেছিলেন ঃ

দীর্ঘকাল ধরে আমি যত্নসহকারে ব্যবহার-শাস্ত্র পড়েছি, একথা সত্যি। তবুও কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায়ে এই শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ওপর আমার অবিশ্বাস ছিল।

আজ ব্যবহারজীবীর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে আমার সেই অবিশ্বাস আরও বেড়েছে। এখন প্রাণের সঙ্গে বুঝেছি যে ব্যবহার-শাস্ত্রে আমি একেবারে অজ্ঞ।

এমন কথা আশুতোষের মুখ থেকে বেরুনোই শোভা পায়! ত্বনিয়ায় যিনি যত জ্ঞানী—তিনিই তত বেশী করে নিজের অজ্ঞতা বুঝতে পারেন। বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তি সক্রেটিসও শত শত বছর আগে এমনি করেই নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।

আট

১৮৮৬ সালের কথা।

তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ইলাবার্ট সাহেব। এই ইলবার্ট সাহেব ছিলেন আশুতোষের গুণমুগ্ধ। ইনি আশুতোষকে নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠান। বলেন ঃ আশুবাবু, আমি আপনার কি উপকার করতে পারি বলুন?

আশুতোষ বিনীতভাবে বল্লেন ঃ আপনি ইচ্ছা করলে আমার অনেক উপকারই করতে পারেন, কারণ আপনি অতি প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। প্রাদেশিক শাসনকর্তা থেকে আরম্ভ করে বড়লাট পর্যন্ত সবাই আপনার পরিচিত। সবার কাছেই আপনি সম্মানীয়। তবে আপনার কাছে আমার বিশেষ কিছু প্রার্থনা নেই। আপনি শুধু অনুগ্রহ করে আমাকে সিনেটের সভ্য অর্থাৎ ফেলো নিযুক্ত করে দিন।

ইলবার্ট সাহেব আশুতোষের প্রার্থনা শুনে অবাক হলেন। কোথায় তিনি ভেবেছিলেন, আশুতোষ হয়তো চাইবেন ভাল চাকরি—তা নয়, চাইলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের ফেলো হতে! ধন, মান, যশ—কিছুই তাঁর কাম্য নয়। কাম্য শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা।

খুব খুশী হলেন ইলবার্ট সাহেব। বল্লেন ঃ হ্যাঁ, আপনার মনোবাঞ্ছা আমি পূর্ণ করব।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আশুতোষের। ইলবার্ট সাহেব শীঘ্রই নতুন চাকরি পেয়ে বিলেত চলে গেলেন। যাবার আগে অবশ্য আশুতোষের জন্যে সুপারিশ করে অনেক চিঠি লিখে রেখে গেলেন। কিন্তু তাতে কিছু ফল হলো না। কারণ বয়স অল্প বলে আশুতোষের ফেলো মনোনয়নের বিপক্ষে অনেকে প্রতিবাদী হলেন। ফলে তখনকারমত আশুতোষের সেনেটের ফেলো হওয়ার স্বপ্ন বিফল হলো।

যাই হোক কিছুকাল পরে আশুতোষ বিলাতে ইলবার্ট সাহেবকে এক চিঠি লিখে জানালেন যে, তিনি ফেলো হতে পারেন নি। ইঙ্গিতে এও জানালেন যে তাঁর সুপারিশে কিছু ফল হয়নি।

যথাসময়ে এ চিঠির জবাব এলো। ইলবার্ট জানালেন ঃ

> লর্ড ল্যান্সডাউন শীঘ্রই ভারতে বড়লাট হয়ে দিল্লী যাচ্ছেন। তাঁকে আমি আপনার কথা বলে দিয়েছি। আশা করি এবার আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

হলোও তাই। লর্ড ল্যান্সডাউন বড়লাট হয়ে ভারতে এলেন। আর ১৮৮৯ সালের ১৬ই জানুয়ারি আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত হলেন। বুথ সাহেব আশুতোষকে বড় ভালবাসতেন। তিনিই এই সুসংবাদ আশুতোষকে প্রথম জানালেন।

সেনেটের সদস্য বা ফেলো—বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সদস্য মাত্র। তার চেয়েও উচ্চ ও ক্ষমতাসম্পন্ন সদস্য-পদ হচ্ছে সিণ্ডিকেটের সদস্য। আশুতোষের এবার ইচ্ছা হলো সিণ্ডিকেটের সদস্য হওয়ার। বুথ সাহেবও তাঁকে এ ব্যাপারে খুব উৎসাহ দিতে লাগলেন।

আশুতোষ যেদিন ফেলো নির্বাচিত হলেন তার দু'মাস পরেই সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্বাচন হওয়ার কথা। আশুতোষ সেই নির্বাচনে জয়যুক্ত হওয়ার আশায় দেখা করলেন ডক্টর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে। ওরা কেউই আশুতোষকে নিরুৎসাহিত করলেন না। তবে সন্দেহ প্রকাশ করলেন এই ভেবে যে হাতে সময় বড় অল্প।

আশুতোষ এর পর গেলেন বিচারপতি ওকেনলির কাছে। ইনি তো আশুতোষকে অনেক আগে থেকে স্নেহ করতেন। কাজেই এ ব্যাপারে তিনিও যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। আশুতোষকে সাহায্যের জন্যে তিনি কর্ণেল জ্যারেটকে নির্দেশ দিলেন। তখন ওকেনলি সাহেব ভারতে মুসলমান শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি আর জ্যারেট সাহেব ঐ বোর্ডের সেক্রেটারি।

সিণ্ডিকেটের এই নির্বাচনে আশুতোষের বিপক্ষদলের পাণ্ডা ছিলেন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ক্রফ্‌ট সাহেব। ইনি আশুতোষের ওপর অনেক আগেই চটেছিলেন। কেন চটেছিলেন তা তোমাদের আগেই বলেছি। কাজেই নানা কৌশলে ইনি নির্বাচনে আশুতোষকে পরাজিত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সে চেস্টা সফল হলো না। জ্যারেট সাহেব ও তাঁর কল্যাণকামী বন্ধুদের সহায়তায় আশুতোষ সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হলেন। তখন তাঁর বয়স চব্বিশ বছর মাত্র।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সেবা করার স্বপ্ন আশুতোষ ছেলেবেলা থেকেই দেখতেন। সেজন্যে আগে থেকেই তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কি কি ভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তার একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি ঃ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো ক্যালেণ্ডার ও মিনিট যখন খুব বেশী জমে যেতো তখন সেগুলি নীলামে বিক্রি করা হতো। সাধারণ লোকের কাছে ঐ কাগজপত্রগুলি আবর্জনাতুল্য মনে হলেও আশুতোষের কাছে ওগুলি ছিল অমূল্য সম্পদ। তিনি ওগুলি নীলাম থেকে কিনতেন এবং বাড়িতে বসে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়তেন।

দেশ-বিদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা সম্পর্কেও অনেক তিনি পড়াশুনা করতেন। পরবর্তীকালে উপাচার্যরূপে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি এই সব জ্ঞানের প্রয়োগ করতেন।

কি করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা যায়, কি করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করা যায়—

এই ছিল আশুতোষের ধ্যান-জ্ঞান। এর জন্যে নিঃস্বার্থভাবে আশুতোষ আজীবন পরিশ্রম করেছেন। দেশের লোক এবং
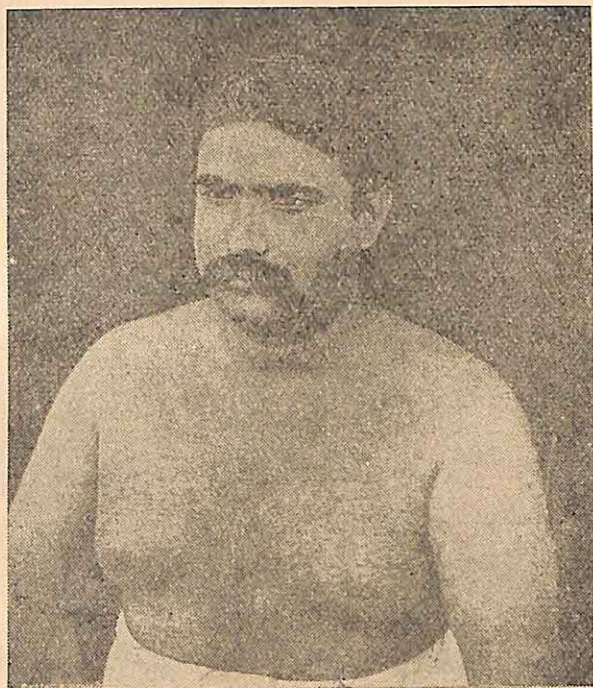
চব্বিশ বছর বয়সে আশুতোষ (১৮৮৮)

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা বুঝতেন। তাই ১৯০৬ সালে আশুতোষের পক্ষে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে উন্নীত হওয়ার পথে কোন বাধাই সৃষ্টি হয়নি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি দু' বছর অন্তর উপাচার্য মনোনীত করার প্রথা। আশুতোষ পর পর চারবার এই পদে মনোনীত হয়েছিলেন। এইভাবে একটানা আটবছর ধরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হয়ে এর সেবা করে গেছেন। এমন সৌভাগ্য ক'জনার ভাগ্যে ঘটে!

আবার ১৯২১ সালে তিনি উপাচার্য মনোনীত হন। কিন্তু তখনকার শিক্ষা-সচিব স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ
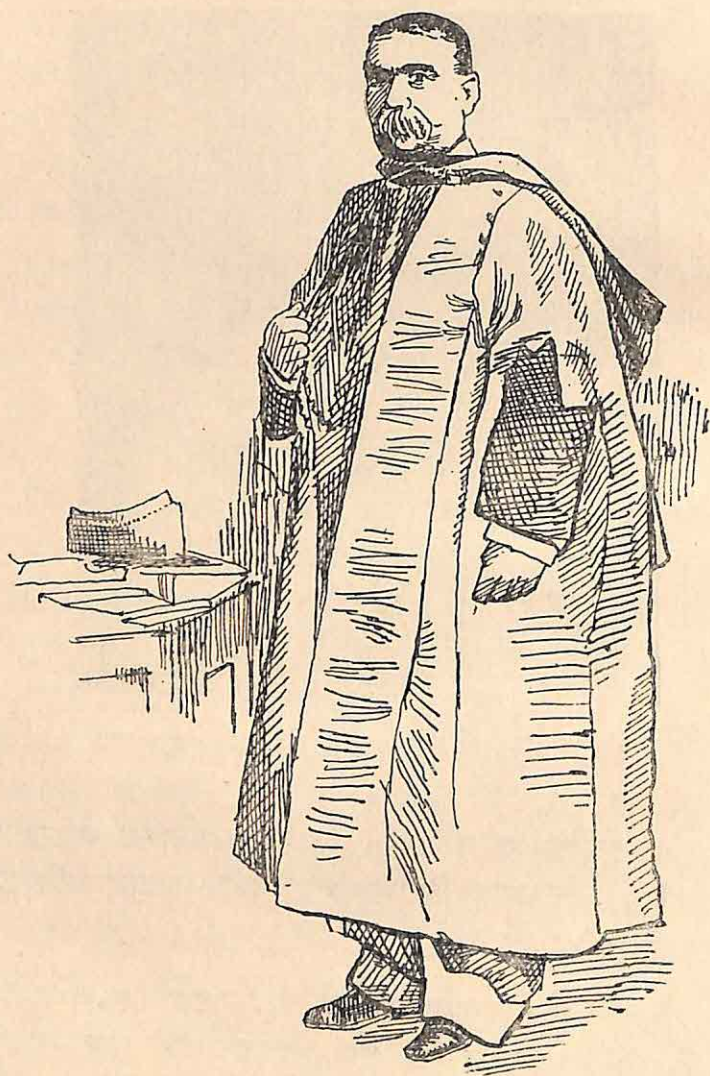
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

ঘটে। আর তার ফলস্বরূপ আশুতোষ ১৯২৩ সালে পদত্যাগ করেন।

এই বিরোধে তখনকার গভর্নর লর্ড লিটন অবশ্য হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং কয়েকটি শর্তে আশুতোষকে পুনরায় কাজ করতে বলেছিলেন। আশুতোষ কিন্তু দৃপ্তকণ্ঠে লাট সাহেবের সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

শুধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়—আরও অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আশুতোষ জড়িত ছিলেন। তিনি তিন-তিনবার এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯০৯ সাল থেকে কয়েক বছর তিনি ভারতীয় যাদুঘরের সভাপতি ছিলেন। ১৯১৪ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি হয়েছিলেন। কয়েক বছর তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ছিলেন।

ভারত সরকার আশুতোষের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও মহত্ত্বের পরিচয় পেয়ে তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন থেকে উনি 'স্যার আশুতোষ' নামে পরিচিত হন। সরকার থেকে তিনি 'সি.এস.আই.' উপাধিও পান। সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তির জন্যে নবদ্বীপ ও ঢাকার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকে যথাক্রমে 'সরস্বতী' ও 'শাস্ত্র বাচস্পতি' উপাধিতে ভূষিত করেন। বৌদ্ধ সঙ্ঘ থেকে তাঁকে 'সম্বুদ্ধাগম-চক্রবর্তী' উপাধি দেওয়া হয়। সব উপাধিগুলি-সমেত আশুতোষের নাম হয়ঃ

মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
সরস্বতী, শাস্ত্র বাচস্পতি, সম্বুদ্ধাগম-চক্রবর্তী,
নাইট, সি. এস. আই., এম. এ., ডি. এল.,
ডি. এস-সি., পি-এইচ. ডি.,
এফ. আর. এ. এস.,
এফ. আর. এস. ই.।

এতগুলি উপাধি আশুতোষের নামের ভূষণ হলেও পিতৃদত্ত 'আশুতোষ' নামের সঙ্গে 'বাবু' শব্দ যোগ করে পরিচিত হতেই তিনি সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন আইন-সংক্রান্ত নিয়মাবলী গঠন করবার জন্যে ১৯০৬ সালে একটি কমিটি গঠিত হয়। সরকার থেকে আশুতোষকে সেই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। আর আশুতোষের সুপারিশেই বিভিন্ন আইন-কানুনের মাধ্যমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি পরীক্ষাশালা থেকে উচ্চশিক্ষার জ্ঞানপীঠে পরিণত হয়।

আবার ১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশন গঠিত হয়। লীড্স বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার মাইকেল স্যাডলার ছিলেন সেই কমিশনের সভাপতি। এই কমিশনের কাজ ছিল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ণয় করে সেগুলি সংশোধনের উপায় উদ্ভাবন করা। এক কথায় শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে এই কমিশন গঠিত হয়। আশুতোষ এই কমিশনেরও সদস্য মনোনীত হন।

স্যাডলার কমিশনের প্রথম কাজ ছিল ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালগুলি পরিদর্শন করা, বড় বড় শিক্ষাবিদ্‌দের সাক্ষ্য ও মতামত গ্রহণ করা ; তারপর শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে কমিশনের নিজস্ব অভিমত লিপিবদ্ধ করে সরকারের কাছে দাখিল করা।

এই কমিশনের সদস্যরূপে আশুতোষ যে কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার তুলনা হয় না। স্যাডলার সাহেব স্বয়ং তাঁর কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন ঃ অন্য কোন স্বাধীন দেশে জন্মালে আশুতোষ সাম্রাজ্যের কর্ণধার হতে পারতেন।

নয়

১৮৮৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আশুতোষের প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সেই বছরই তিনি সিণ্ডিকেটের ফেলো নির্বাচিত হন। তারপর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এই দীর্ঘকালের ইতিহাস অনুধাবন করলে বোঝা যায়—আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতটা উন্নতি সাধন করে গেছেন।

উপাচার্য হওয়ার আগে এবং পরেও আশুতোষের যথেষ্ট কর্তৃত্ব ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। কোন মহৎ কাজ করতে গেলেই প্রতিপক্ষ থাকে—সামলোচক থাকে। আশুতোষের প্রতিপক্ষও নিতান্ত কম সংখ্যক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মনস্বিতা, যুক্তি-তর্কের বল এবং জ্ঞানের পরিসর দেখে প্রতিপক্ষরা হটে যেতেন। তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারতেন না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একবার বলেছিলেন ঃ

আশুতোষকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধাতা পুরুষ বললেও অত্যুক্তি হয় না। কথাটা সর্বতোভাবে সত্যি।

আশুতোষের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগসূত্র স্থাপিত হবার আগে বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র পরীক্ষা গ্রহণের একটি কেন্দ্র ছিল। কবে কোন্ পরীক্ষা গৃহীত হবে, কে কোন্ প্রশ্ন করবেন, কে খাতা পরীক্ষা করবেন, কোথায় কোন্ পরীক্ষা গৃহীত হবে—এইসব ব্যবস্থা করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য শেষ হত। তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন গঠনমূলক পরিকল্পনাই ছিল না। এ ব্যবস্থা আশুতোষের মনঃপূত হয় নি। তাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন ধাঁচে ঢেলে গড়তে চেয়েছিলেন। একে প্রাচ্য জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন।

আশুতোষের প্রধান কীর্তি—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা।

যে কোন মহৎ কাজেই টাকার দরকার হয়। এ কাজেও তাই টাকার দরকার হলো। কিন্তু অত টাকা পাওয়া যাবে কোথায় ? টাকার আশায় সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। এইখানেই কাজে লাগলো আশুতোষের বিরাট ব্যক্তিত্ব। তাঁর সঙ্গে দেশের অনেক ধনী ব্যক্তির পরিচয় ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্যে এই সব ধনী ব্যক্তিরা আশুতোষকে সাহায্য করলেন। তাঁরা মুক্ত হস্তে বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থদান করতে লাগলেন।

বন্যার জলস্রোতের মত চারদিক থেকে অজস্র টাকা দান হিসাবে আসতে লাগলো। এই সব মহান্ দাতাদের মধ্যে কলকাতার স্যার তারকনাথ পালিত, খয়রার রাজা বাহাদুর, দিনাজপুরের তারকনাথ চৌধুরী, মৈমনসিংয়ের গোপালদাস চৌধুরী ও শোনপুরের মহারাজার নাম উল্লেখযোগ্য।

দেখতে দেখতে আশুতোষের কাজও সুরু হলো। এতদিন মাত্র দু-তিন জন কেরানী নিয়ে রেজিষ্ট্রার সাহেব কাজ করতেন। এখন কর্মচারীর সংখ্যা বেড়ে দেড় শো জনে দাঁড়ালো। অধ্যাপকের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলো। উচ্চ শিক্ষার কলা বিভাগে ইংরেজী, সংস্কৃত, পালি, আরবি, পারসী, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি মোট কুড়িটি বিভাগের সৃষ্টি হলো। আর বিজ্ঞানে—রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, উচ্চতর গণিত, জড় বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভাগের সৃষ্টি হলো। সব বিভাগেই মৌলিক গবেষণার ব্যবস্থা করা হলো।

এ ছাড়াও সংস্কৃত বিভাগটিকে যথাসম্ভব পূর্ণ রূপ দেওয়া হলো। পালি শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হলো। প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষায় উৎসাহ দেবার জন্যে বাংলা ভিন্ন হিন্দী, মৈথিলী, ওড়িয়া, অসমীয়া প্রভৃতি ভাষার প্রাচীন সাহিত্য পরিচয় সঙ্কলন করা হলো। ইস্‌লামিক বিষয়ের জ্ঞান বিস্তারেরও ব্যবস্থা হলো।

এতদিন কলকাতার কলেজগুলিতে এম. এ. পড়ানো হতো। আশুতোষ তা বন্ধ করলেন। এম. এ. এবং আইনের অধ্যাপনা একমাত্র

বিশ্ববিদ্যালয়েই কেন্দ্রীভূত করলেন। তিনি দেশের সেরা অধ্যাপকদের নিয়ে এসে এই সব ক্লাসে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত করলেন।

প্রৌঢ় বয়সে আশুতোষ (১৯২২)

আশুতোষ ছিলেন পাকা জহুরী। তিনি নিজে ছিলেন প্রতিভাবান, আর প্রতিভাবান ব্যক্তিকে চিনে নিতেও তাঁর কষ্ট হতো না। তিনি বলতেন : জ্ঞান পথের পান্থের জাতিভেদ নেই, বর্ণবিচার নেই। তাই তাঁর ডাকে দেশ-বিদেশের সেরা পণ্ডিতেরা ছুটে এসেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে। এইসব পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মহারাষ্ট্রের ডি. আর. ভাণ্ডারকর, ত্রিবাঙ্কুরের অনন্তকৃষ্ণ রাও, বিহারের ভাগবত সহায়, কাশীর সীতারাম শাস্ত্রী, প্রয়াগের

গণেশপ্রসাদ, মাদ্রাজের চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ ও সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, পারস্যের সিরাজী, জাপানের খাস্থদা, বৃটেনের স্টিফেন ও জার্মানীর ব্রুল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এমনিভাবে আশুতোষ দেশ-বিদেশের জ্ঞানী-গুণীদের নিয়ে এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিতের 'হাট' বসিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ বর্তমানে ভারতের রাষ্ট্রপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন ; আর চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। এঁদের জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গর্ব অনুভব করেন।

আশুতোষের আন্তরিক প্রচেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখনই বিশ্ববাসীর চোখে যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করেছিল। তাই ভারতের মহামান্য সম্রাট্ এসে নত মস্তকে এখান থেকে উপাধি নিয়ে গেছেন। উপাধি নিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, সি. ভি. রমন, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অবনীন্দ্রনাথ ও আরও অনেক মনীষী।

অধ্যাপক নিয়োগের সময় আশুতোষ প্রার্থী হিন্দু কি মুসলমান, বাঙালী না মাদ্রাজী—তা বিচার করতেন না। বিচার করতেন প্রার্থীর গুণ ও যোগ্যতার। স্নাতকোত্তর বিভাগে যে সব লোককে আশুতোষ অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করতেন, তাঁদের হাতেই বিভাগের সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন। তাঁদের কাজে কখনই হস্তক্ষেপ করতেন না। এতটা স্বাধীনতা পাওয়ার ফলে অধ্যক্ষরাও তাঁদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতেন। আশুতোষ যোগ্য ব্যক্তিকে সর্বদাই উৎসাহিত করতেন—পুরস্কার দিতেন।

তোমরা হয়তো ভাবছ যে, ভারতবর্ষ তো একটা বিরাট দেশ। এ দেশের কোথায় জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি আছেন তার সংবাদ আশুতোষ কিভাবে পেতেন ? শোন তবে সে কথা :

একবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ খালি হলো। আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার খুঁজে খুঁজে দেখলেন যে অমরেশ্বর ঠাকুর নামে এক ব্যক্তি সংস্কৃতের তিনটি

বিভাগে কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এ. পাশ করেছেন। তাই দেখে আশুতোষের মন খুশীতে ভরে উঠলো। অমরেশ্বর ঠাকুরকে ডেকে এনে তিনি ঐ পদে নিযুক্ত করলেন। এমনি ভাবে বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার খুঁজে তিনি কৃতী ছাত্রদের ডেকে আনতেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে নিযুক্ত করতেন।

আশুতোষের সুপারিশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন পরীক্ষার নাম পরিবর্তন করে। যেমন এণ্ট্র্যান্স হয় ম্যাট্রিকুলেশন, এফ. এ. হয় আই. এ. এবং আই. এস-সি.। বি. এ.-র 'এ' কোর্স হয় বি. এ. আর 'বি' কোর্স হয় বি. এস-সি.। সেই সঙ্গে এম.এ. ও এম.এস-সি. নামও প্রবর্তিত হয়।

এতদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার কোন স্থান ছিল না। কিন্তু আশুতোষের চেষ্টায় মাতৃভাষা তার যোগ্য সম্মান পায়। সকল পরীক্ষাতেই বাংলা ভাষা প্রধান পাঠ্য বিষয়ের মর্যাদা লাভ করে। এবং আশুতোষের চেষ্টাতেই বাংলা সাহিত্যে গবেষণার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। আবার তাঁরই উৎসাহে দেশের খ্যাতিমান পণ্ডিতেরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখেন, লেখেন সহজিয়া সাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলী ও বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা। আবার আশুতোষের ঐকান্তিক চেষ্টাতেই অনেক গবেষক দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে সেগুলি প্রকাশ করাও হয়।

কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা আশুতোষের আর এক অক্ষয় কীর্তি। বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করে আশুতোষ বাঙালীর ছেলেদের বিজ্ঞান-সাধনার পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে গেছেন। এখান থেকে শিক্ষা লাভ করে, এখানে গবেষণা করে বহু ভারতীয় ছাত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন—দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

১৯২২ সালের কথা।

লর্ড লিটন তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য (চ্যান্সেলার)। ইনি কোনও এক সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সংশোধিত ও কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়কে অসংশোধিত বিশ্ববিদ্যালয় নামে অভিহিত করেছিলেন। এতে আশুতোষ অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন।

লর্ড লিটনের এই বক্র উক্তির সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন আশুতোষ সমাবর্তন উৎসবের সভায়। আশুতোষের সেই নির্ভীক জবাবে লাট সাহেব খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই উৎসবের শেষে পোশাক বদলাবার ঘরে গিয়ে তিনি আশুতোষকে বলেছিলেন ঃ

> আপনি আপনার চ্যান্সেলারের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখান নি।

উত্তরে আশুতোষ বলেছিলেন ঃ

> আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার হিতাকাঙ্ক্ষী সকলের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল ও অনুরক্ত।

এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়—আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কতখানি ভালবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন।

উপাচার্যের পথে অধিষ্ঠিত হয়ে আশুতোষ প্রশ্ন করার চিরাচরিত রীতি, এমন কি নম্বর দেওয়ার রীতিরও পরিবর্তন সাধন করেন। তাঁর আগে সচরাচর একটা ধারণা ছিল যে—উত্তর যতই ভাল হোক না কেন, পুরো নম্বর কিছুতেই দেওয়া যায় না। আশুতোষ তখন বলেন ঃ

> তা কেন হবে। লেখা যদি ক্রটিহীন হয়ে থাকে তবে পরীক্ষক তার নম্বর কাটবেন কেন ? পুরো নম্বর ছাত্রের পাওয়ার জন্যেই রাখা হয়েছে। তা কমাবার অধিকার কারুর নেই।

এমন ছাত্র-দরদী উপাচার্য খুব কমই দেখা যায়।

আশুতোষের সময় ম্যাট্রিকুলেশন থেকে সুরু করে বি. এ. পর্যন্ত সব পরীক্ষাতেই ছাত্রেরা বেশী সংখ্যায় পাশ করতে থাকে। তাতে আশুতোষের প্রতিপক্ষরা হৈ-চৈ সুরু করে দেন। তাঁরা বলেন ঃ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রসাতলে গেল। উচ্চশিক্ষার মান কমে গেল। পাশ ক'রে ছাত্রেরা জাতীয় শিক্ষার দৃষ্টান্ত স্বরূপ না হ'য়ে জাতীয় আবর্জনা স্বরূপ হলো। কাজেই উত্তীর্ণ ছাত্রদের এই ভীতিজনক সংখ্যা শীঘ্রই কমানো উচিত, নইলে দেশের সর্বনাশ হবে।

প্রতিপক্ষদের এই সব উক্তি শুনে আশুতোষ মনে অত্যন্ত ব্যথা পেলেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি তখন বল্লেন ঃ

যদি ছেলের পাশ না করিয়ে অযথা ঠেকিয়ে রাখা হয়, তবে তারা সরকারের শত্রু হবে, দেশের বেকার সমস্যা বাড়াবে, চুরি ডাকাতি করবে। সেটা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে না।

আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের সংখ্যায় যাঁরা আপত্তি জানিয়েছেন তাঁরা জেনে রাখুন যে, বিলাতের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এর চেয়ে বেশী সংখ্যক ছাত্রদের পাশ করানো হয়। কিন্তু সেদেশে তো উত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা কমাবার জন্যে আন্দোলন করা হয় না। কাজেই যাঁরা এই ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 'ভীতিজনক সংখ্যা' কথাটি ব্যবহার করেছেন, তাঁদের লজ্জা হওয়া উচিত। কারণ ছাত্রদের উন্নতি এবং কৃতিত্ব সবারই কাম্য। তা কখনও ভীতিজনক হতে পারে না।

দেশে এখন উচ্চশিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হয়েছে—এ কথা আপনারা অস্বীকার করতে পারেন ? অজস্র ছাত্র আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের লৌহদ্বার ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করতে পারতো না—মূর্খ হ'য়ে ঘরে বসে থাকতো। আর আজ ? আজ দলে দলে ছাত্র বি. এ., এম. এ. পাশ করছে। আগে যারা একখানি খবরের কাগজ অতি কষ্টে পড়তো, আজ তারা বড় বড় ইংরাজী বই ও পত্রিকা পড়ে বুঝছে। আজ বাংলার পল্লীতে পল্লীতে খুঁজলে অনেক গ্র্যাজুয়েট পাওয়া যাবে। আর ছাত্রদের

শিক্ষার মান মোটেই কমে নি। এ দেশের ছাত্রেরা বিদেশে গিয়েও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করছে।

কোথায় আপনারা চাইবেন দেশব্যাপী শিক্ষার আরও প্রসার, তা নয় আপনারা শিক্ষার্থীদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। এ অতি জঘন্য মনোবৃত্তি। জনশিক্ষা সুদূরপ্রসারী হওয়া দরকার—যাতে বাংলার শহর কেন গ্রামেরও প্রতিটি লোক যেন অন্ততঃ ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে। যেদিন দেখব বাংলা দেশের প্রতিটি ঠাকুর-চাকর পর্যন্ত ম্যাট্রিক পাশ, সেদিন বুঝব এ দেশের শিক্ষা বিস্তার কিছুটা সফল হয়েছে।

আশুতোষের এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়—তাঁর সময় এ দেশে উচ্চশিক্ষার প্রসার কতটা হয়েছিল এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি কি করতে চেয়েছিলেন।

দশ

আশুতোষকে বলা হতো 'বাংলার বাঘ'—একথা সর্বজনবিদিত। আশুতোষের নামের সঙ্গে এই বিশেষণটি কি ভাবে যুক্ত হলো তা শোন।

আশুতোষের আমলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ছিলেন তাঁর নাম রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ। ইনি একদিন অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে ভোরবেলায় ট্রামে চড়ে আশুবাবুর বাড়ি যাচ্ছিলেন। ময়দানের কাছাকাছি এসে দীনেশবাবু বল্লেন :

বিদ্যাভূষণ, আশুবাবু বোধহয় এখনও ময়দানে বেড়িয়ে বাড়ি ফেরেন নি।

এই কথা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দূরে ময়দানে আশুবাবুকে দেখা গেল। তিনি গুটিকয় বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ময়দানে

হেঁটে বেড়াচ্ছেন। আর তাই না দেখে বিদ্যাভূষণের চোখ দু'টি হর্ষোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি আশুবাবুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন ঃ ঐ বাঘ! ঐ বাঘ! তাই শুনে দীনেশবাবু হেসে উঠলেন।

সেইদিনই কথাটা আশুতোষের কানে উঠলো; কিন্তু তিনি এ কথা শুনে কোনরকম বিরক্তি প্রকাশ করলেন না, বরং হাবভাবে বোঝালেন যে কথাটা তিনি বেশ উপভোগ করেছেন।

এরপর রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ যেখানে সেখানে আশুতোষের নামের সঙ্গে ঐ বিশেষণটি যোগ করে কথা বলতেন।

এইখানেই শেষ নয়।

ফরাসী সচিব ক্লাঁমাসোঁর সঙ্গে আশুতোষের আকৃতি ও প্রকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য ছিল। আশুতোষেরই মত এই ফরাসী পুরুষ দুর্জয়, উদ্যম ও অরণ্য তেজের অধিকারী ছিলেন। ইনিও আশুতোষের মত পোশাক-পরিচ্ছদে ছিলেন অনাড়ম্বর, স্পষ্টবক্তা ও দেশহিতকর কাজে ব্রতী। ফরাসী দেশে 'ক্লাঁমাসোঁ' নরশার্দুল নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

এই ক্লাঁমাসোঁ একবার কলকাতায় এলেন। তখন অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ বেরুলো। তাতে আশুতোষের সঙ্গে আকৃতি প্রকৃতিগত তুলনা করা হলো ক্লাঁমাসোঁর। আর আশুতোষকে 'বাংলার বাঘ' নামে অভিহিত করা হলো।

ইতিমধ্যে কোনও এক চিত্রকর 'বাংলার বাঘের' এক ব্যঙ্গচিত্র এঁকে সেটি খবরের কাগজে প্রকাশ করলেন। দেশবাসী সেই প্রবন্ধ ও এই ব্যঙ্গচিত্র সহজেই অনুমোদন করলেন। আর সেই থেকে আশুতোষের 'বাংলার বাঘ' নামটি চালু হয়ে গেল।

আশুতোষের পাশে 'বাঘ' শব্দটি প্রয়োগের একটা সার্থকতা আছে। বাঘের মতই ছিল তাঁর দুর্জয় শক্তিমত্তা। এ শক্তিমত্তার পরিচয় সিনেটের সভ্যেরা বহুবার পেয়েছেন। সিনেটের সভায় প্রতিপক্ষদের কঠোর সমালোচনার উত্তরে আশুতোষ মাঝে মাঝে

তেজোদৃপ্ত উত্তর দিতেন, অনেক সময় তা বাঘের গর্জনকেও হার মানাতো।

একবার এ্যাকাউন্ট্যাণ্ট জেনারেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ের ব্যাপারে সমালোচনা করেছিলেন। বলেছিলেন ঃ

বিশ্ববিদ্যালয় অসতর্ক ও বে-হিসাব খরচের দ্বারা দেউলিয়া হবার মুখে।

আর যায় কোথায়! বিরোধী পক্ষের সদস্যেরা আশুতোষের পেছনে লাগলেন। এ্যাকাউন্ট্যাণ্ট জেনারেলের মন্তব্যের প্রতি আশুতোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কৈফিয়ত চাইলেন। উত্তরে আশুতোষ বল্লেন ঃ

এ্যাকাউন্ট্যাণ্ট জেনারেলের কি দুঃসাহস যে সরকারের বিধিবদ্ধ এই মহাপ্রতিষ্ঠান—এই সিনেটের বিদ্বজ্জন মণ্ডলীর সম্যকরূপে আলোচিত ও সুবিবেচিত সিদ্ধান্তের ওপর মন্তব্য জাহির করেন! সিনেট সভ্য থেকে যে সব ব্যয় মঞ্জুর করা হয় তা তিনি পরীক্ষা করতে পারেন, দেখতে পারেন বিনা মঞ্জুরীতে কোন ব্যয় হয় কিনা; কিন্তু ব্যয়ের যৌক্তিকতা সম্পর্কে মত প্রকাশের কোন অধিকার এ্যাকাউন্ট্যাণ্ট জেনারেলের নাই।

আসুন দেখি এ্যাকাউন্ট্যাণ্ট জেনারেল সাহেব একবার। বলুন দেখি ৪০ লক্ষ অথবা ৫০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়েছে, সেজন্যে সরকারের ব্যয় কমানো হোক। তিন জন মন্ত্রী অথবা কয়েকজন কমিশনার বা জেলা শাসকের পদ কমানো হোক। অথবা বলুন দেখি একবার যে লর্ড চেমস্‌ফোর্ড এবং মণ্টেগুর রাষ্ট্রনীতি ভাল হয় নি অথবা সামরিক বিভাগে এতগুলি কর্মচারী ও অস্ত্রের সাজসজ্জা থাকা নিষ্প্রয়োজন। আসুন দেখি একবার তাঁর কাট-ছাঁটের যন্ত্রটি হাতে নিয়ে। রেলওয়ের খরচে হাত দিন দেখি। তা হবারটি নয়। সেনেটের ও শিক্ষা বিভাগের কি দরকার তা বিচারের জন্যে যোগ্য ব্যক্তিরা আছেন। এ বিষয়ে এ্যাকাউন্ট্যাণ্ট জেনারেলের কথা বলার কোন

অধিকারই নেই এ শুধু তাঁর গায়ের জোর ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর একবার বিশ্বলিদ্যালয়ের অর্থ সঙ্কট দেখা দেয়। তখন শিক্ষা মন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়কে আড়াই লক্ষ টাকা মঞ্জুরী দেবার আশা দিয়ে সিনেটকে কোন কোন বিষয়ে সর্তে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। ১৯২২ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে সিনেটের সভায় সরকারের এই নীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বাংলার বাঘ' কি বলেছিলেন জান? বলেছিলেন ঃ

> আজ বড় সৌভাগ্য যে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জীবিত নেই। আজ তিনি থাকলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এ লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করতেন। সেই প্রতিবাদে সিনেট হল মুখরিত হয়ে উঠতো। তাঁর আত্মমর্যাদাজ্ঞান ও নির্ভীকতা ছিল দেশ-বিশ্রুত। তিনি এই ব্যবহার কিছুতেই বরদাস্ত করতেন না। আজ ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ এবং আনন্দমোহন বসুও নেই। তাঁরা জীবিত থাকলে তাঁদের রোষব্যঞ্জক প্রতিবাদ এই সিনেট হলের সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হতো।
>
> আর আমার কথা যদি বলতে হয় তবে জেনে রাখুন, যে পর্যন্ত আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকবে, সে পর্যন্ত আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবমাননা বরদাস্ত করব না। আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলাম তৈরির যন্ত্রশালায় পরিণত হতে দেব না। আমরণ সত্যের প্রতি অনুরাগ দেখাব, স্বাধীন মনোবৃত্তি শিক্ষা দেব। কিছুতেই এই বিশ্ববিদ্যালয়কে সেক্রেটারীদের দপ্তরে আত্মসাৎ হতে দেব না।
>
> আপনারা মনে রাখবেন যে—যে টাকাটা আমাদের দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছে, তা কোন স্থায়ী দান নয়, এমন কি এটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে বাৎসরিক দানও নয়। এর জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা চিরতরে বিসর্জন দিতে

হবে ? কর্তৃপক্ষের কি অধিকার আছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ও অধিকার নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলেন ? আমরা যদি আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা বিক্রি করি তবে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা কি আমাদের ধিক্কার দেবে না ?

আমার এক হাতে যদি টাকা ও আর এক হাতে দাসত্ব দেওয়া হয় তবে আমি সেই টাকাকে ঘৃণা করব। অমন টাকা নেব না। বরং খরচ কমিয়ে যাতে টিকে থাকতে পারি তারই চেষ্টা করব। দেশের লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করব, দেশবাসীর সুপ্ত আত্মশক্তিবোধ জাগিয়ে তুলব, তবুও স্বাধীনতা ছাড়ব না।

ভেবে দেখ কি আবেগ, কি যুক্তি ও কি জ্বালাময়ী ভাষা ছিল আশুতোষের বক্তৃতায় !

এগারো

আশুতোষের পিতা গঙ্গাপ্রসাদ ছাত্রাবস্থায় বিয়ে করেছিলেন। আশুতোষও তাই। যে বার তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান সেই বারই তাঁর বিয়ে হয়।

জামাই হিসাবে আশুতোষের মত প্রতিভাবান ও কৃতবিদ্য পাত্র পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। তাই অনেক মেয়ের বাপই গঙ্গাপ্রসাদের দুয়ারে ধর্ণা দিয়েছিলেন। এক ধনী ব্যক্তি সুধু যৌতুক বাবদ তিরিশ হাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে আশুতোষকে উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেত পাঠিয়ে শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবেন বলে জানিয়েছিলেন। আর একজন দশ হাজার টাকা যৌতুক দিতে রাজি হয়েছিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদ কিন্তু অর্থলোভী ছিলেন না। তাই তিনি এই সব

প্রলোভনে প্রলুব্ধ হন্ নি। ধনী ব্যক্তিদের সকল প্রস্তাবই তিনি প্রত্যাখান করেছিলেন। সেজন্য অনেকে তাঁকে বৈষয়িক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ বলে উপহাস করেছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ কিন্তু সেই সব উপহাসে ভ্রূক্ষেপ করেন নি।

তা ভিন্ন গঙ্গাপ্রসাদ যে কেবল ছেলের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী ছিলেন, তা নয়। আশুতোষের ভবিষ্যৎ সাংসারিক সুখের ব্যাপারেও সতর্ক ছিলেন। তিনি ধনীর দুলালী বা রাজকন্যা ছেলের ঘাড়ে চাপাতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কারণ সে ক্ষেত্রে কন্যা পিতৃগৃহের অহংকারে স্বামীর প্রতিও হয়তো অশ্রদ্ধা দেখাবে; দাম্পত্য জীবনে ছেলে তাহলে অসুখী হবে।

তাই অনেক মেয়ে দেখাদেখি ও বাছাবাছির পর কৃষ্ণনগরের এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পণ্ডিত রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের মধ্যমা কন্যা যোগমায়া দেবীকে গঙ্গাপ্রসাদ পছন্দ করলেন। যোগমায়া দেবী ছিলেন সাক্ষাৎ লক্ষী স্বরূপিনী। ১৮৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে এঁকেই অশুতোষ বধূরূপে বরণ করেন।

আশুতোষের বিয়ের পরের বছরই ওঁদের পরিবারে এক আকস্মিক বিপর্যয় ঘটে। আশুতোষের ছোট ভাই অকালে মারা যান। বি. এ. পাশ করার পর মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। গোটা পরিবারটা শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। গঙ্গাপ্রসাদ একেবারে মুষড়ে পড়েন। তবে সুখের বিষয়, দীর্ঘকাল তাঁকে এই শোকার্ত জীবন যাপন করতে হয় নি। এর দু' বছর পরেই গঙ্গাপ্রসাদ ইহলোক থেকে বিদায় নেন্। জীবনে দ্বিতীয়বার কঠিন আঘাত পান আশুতোষ।

আশুতোষের চার পুত্র ও তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠপুত্র রমাপ্রসাদ প্রথম জীবনে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ আইনজীবি। পরবর্তীকালে তিনি বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

দ্বিতীয় পুত্র শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা। প্রথম জীবনে শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন ব্যারিষ্টার। পরে রাজনীতিতে

যোগ দিয়ে হিন্দু মহাসভার সভাপতি হন। কয়েকবছর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। দেশ স্বাধীন

আশুতোষ-পত্নী যোগমায়া দেবী

হওয়ার পর শ্যামাপ্রসাদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় অন্যতম মন্ত্রীরূপে যোগ দিয়েছিলেন। কিছুকাল মন্ত্রিত্ব করার পর প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার ফলে তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। কাশ্মীরী হিন্দুদের স্বার্থের অনুকূলে আলোচনার জন্যে এর পর তিনি কাশ্মীর যান। সেখানে তাঁকে বন্দী করা হয়; আর বন্দী অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আশুতোষের তিন কন্যা—কমলা, অমলা ও রমলা। বড় মেয়ে কমলা দেবী বিয়ের অল্পকাল পরেই বিধবা হন। আশুতোষ জীবনে তৃতীয়বার কঠিন আঘাত পান। মেয়ের বৈধব্য বেশ তিনি সহ্য

করতে পারেন না। বিধবা মেয়ের আবার বিয়ে দেবেন বলে স্থির করেন।

বিদ্যাসাগর মশাই এর আগে বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ করেছিলেন ; কিন্তু হিন্দু সমাজে তখনও বিধবা বিবাহের চলন তেমন হয়নি। তাই দ্বিতীয়বার মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে আশুতোষকে গোঁড়া হিন্দুদের বিদ্রূপ ও কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই বিয়ের আগে ও পরে নানা সভা-সমিতি ও খবরের কাগজের মাধ্যমে আশুতোষের বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন হয়েছিল। কিন্তু সে সব বিরুদ্ধতা আশুতোষকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারেনি। তিনি কমলা দেবীর আবার বিয়ে দিয়েছিলেন।

কমলা দেবী
(জন্ম : ১৮ই এপ্রিল, ১৮৯৫ মৃত্যু : ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯২৩)

কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডাবে কে ? এবারও কমলা দেবী বিধবা হলেন। ভাগ্যের কাছে দ্বিতীয়বার পরাজয় স্বীকার করে আশুতোষ নিরস্ত হলেন, কিন্তু বিধাতার ক্রোধের উপশম হলো না। কন্যা-

স্নেহে অন্ধ হয়ে আশুতোষ তাঁর কন্যার ভাগ্যের বিরোধিতা করবার চেষ্টা করেছিলেন। বিধাতা বোধহয় তাই রুষ্ট হয়েছিলেন। বিধাতার সেই রুদ্র রোষ শীঘ্রই প্রকাশ পেলো। কমলা দেবীকে তিনি নিজের কাছে টেনে নিলেন। চোখের জলে আশুতোষের বুক ভেসে গেল।

কন্যার মৃত্যুতে নিদারুণ আঘাত পেলেও মানসিক স্থৈর্য্য হারান নি আশুতোষ। কন্যার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি চল্লিশ হাজার টাকা দান করলেন। 'কমলা স্মৃতি বক্তৃতা'র ব্যবস্থা হলো। জাতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিতেরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বক্তৃতা দেবেন। দানের টাকার সুদ থেকে বক্তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। কমলা স্মৃতি বক্তৃতার ব্যবস্থা করে আশুতোষ তাঁর স্নেহময়ী কন্যার স্মৃতিকে চিরজাগরূক রাখার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আশুতোষের মধ্যমা কন্যা অমলা দেবী। ব্যারিষ্টার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। আর কনিষ্ঠা কন্যা রমলা দেবীর বিয়ে হয় ডাক্তার অনাথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

১৯১৪ সালের ১৩ই এপ্রিল।

কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কাশিমবাজারে একটি সভায় সভাপতিত্ব করার জন্যে আশুতোষকে আমন্ত্রণ জানালেন। এর কিছুদিন আগে থেকেই আশুতোষের মা জগত্তারিণী দেবী অসুস্থ ছিলেন। মায়ের অসুস্থতার জন্যে আশুতোষের মন চাইছিল না বাইরে যেতে। কিন্তু জগত্তারিণী দেবী বল্লেন ঃ ওরে, দু'একদিনের জন্যে গেলে আর ক্ষতি কি ? তুই যা।

মায়ের অনুমতি নিয়ে আশুতোষ কাশিমবাজার গেলেন। পরের দিনই কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম গেল 'জগত্তারিণী দেবী আর ইহলোকে নেই। সন্ন্যাস রোগে তিনি দেহত্যাগ করেছেন।'

টেলিগ্রাম পেয়ে আশুতোষের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে

পড়লো। তিনি তখনই কলকাতা রওনা হলেন। যথারীতি মায়ের সৎকার করলেন কিন্তু জীবনে তাঁর একটা বড় ক্ষোভ রয়ে গেল—তা হচ্ছে মৃত্যুকালে মায়ের পাশে থাকতে না পারা। মায়ের শেষ কথাগুলি শুনতে না পারা।

পরিণত বয়সেই জগত্তারিণী দেবী মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু আশুতোষের কাছে তিনি ছিলেন পরমারাধ্যা দেবী। এই দেবীর পুণ্যস্মৃতি রক্ষা করার জন্যে আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদালয়কে মোটা টাকা দান করলেন। সেই টাকার সুদে প্রবর্তিত হলো 'জগত্তারিণী পদক'।

১৯২৩ সাল শেষ হলো।

বিচারপতি হিসাবে আশুতোষের কার্যকালের মেয়াদও ফুরলো। ইচ্ছা হল কিছুদিন বিশ্রাম নেবেন কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না।

ডুমরাওনের মহারাজা এক জটিল মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। আশুতোষকে সেই মামলার পরিচালনভার গ্রহণ করতে হলো। বিচারপতি আশুতোষ শেষবারের মত উকিলের সাজে সজ্জিত হলেন।

এই মামলার ব্যাপারে আশুতোষকে পাটনায় যেতে হতো। কিন্তু ছোট ছেলে বামাপ্রসাদ তখন অসুস্থ। তাই তিনি নির্ভাবনায় পাটনায় থাকতে পারতেন না। একবার পাটনা, একবার কলকাতা—এমনিভাবে ছোটাছুটি করে বেড়াতেন।

১৯২৪ সালের মে মাস।

আশুতোষ তখন কলকাতায়। বামাপ্রসাদ গুরুতর অসুস্থ। এরই মধ্যে পাটনা হাইকোর্ট থেকে জরুরী তার এলো ঃ আদালতে হাজির হতে হবে।

ছেলের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। কি করে এ অবস্থায় তাকে ছেড়ে তিনি পাটনা যান। তাই পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে তার করা হলো ঃ অনুগ্রহ করে শুনানীর দিন পেছিয়ে দিন।

দিন পেছুলো।

বামাপ্রসাদ কয়েকদিন বাদে একটু সুস্থ বোধ করলেন। অসুস্থ বামাপ্রসাদ পিতার কাছে বায়না ধরেছিলেন—একটা মোটরগাড়ী কিনে দিতে হবে। আশুতোষ বলেছিলেন ঃ

দেব রে, নিশ্চয়ই দেব। তুই সেরে উঠলেই কিনে দেব। কথা দিচ্ছি।

—জীবনে আশুতোষের সেই শেষ প্রতিশ্রুতি। এ প্রতিশ্রুতি কিন্তু আর পূরণ হয়নি।

১৯শে মে আশুতোষকে পাটনায় যেতে হলো। বামাপ্রসাদকে তখন একটু সুস্থ দেখেই তিনি গিয়েছিলেন।

২২শে মে পাটনায় তাঁর মোটরগাড়ীর সোফার তাঁকে বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলো। ধনী-নির্ধন সবার বাড়ীতেই আশুতোষ নিমন্ত্রণরক্ষা করতে যেতেন। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

পরের দিনই তাঁর সামান্য জ্বর দেখা দিল। সেই সঙ্গে নানান উপসর্গ। জ্যেষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ তখন পাটনায়। কলকাতা থেকে ডাক্তার আনবার জন্যে তিনি তাঁর মাকে টেলিগ্রাম করলেন। ডাক্তারও এলেন। কিন্তু তখন আশুতোষের শেষ অবস্থা। রবিবার ২৫শে মে 'বাংলার বাঘ' আশুতোষ চিরবিদায় নিলেন। স্পেশাল ট্রেনযোগে তাঁর মরদেহ কলকাতায় এনে ভাগীরথীর তীরে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হলো। মনীষী আশুতোষের তিরোধনে শোকে ভেঙে পড়লো সারা বাংলা দেশ।

বারো

আশুতোষের বিরাট কর্মময় জীবনে বিচ্ছিন্নভাবে নানান ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনাগুলি তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন গুণরাজির পরিচয় দেয়। বিচ্ছিন্ন সেই ঘটনাগুলিকে একত্রে গেঁথে এই অধ্যায়টি রচিত হয়েছে। শোন সেই গল্পগুলি।

১। রসিক আশুতোষঃ

(ক) রবিবারের বিকেল বেলা। একটি ছাত্র আশুতোষের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ছাত্রটি আগে কখনও আশুতোষকে দেখে নি। সে এসে দাঁড়িয়েছে আশুতোষের বাড়ির বারান্দার সামনে।

ঐ বারান্দা দিয়ে তখন খালি গায়ে হাঁটুর ওপর ধুতি পরে একটি লোক যাচ্ছিল। লোকটিকে দেখে ছাত্রটি বল্ল ঃ

আমি আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারি কি ?

লোকটি বল্ল ঃ কি দরকার আমাকেই বলুন। আমি আপনার কথা আশুবাবুকে বলে দেখা করার ব্যবস্থা করে দেব।

ছাত্রটি কিন্তু তাতে রাজি হলো না। সে বারবার বলতে লাগলো ঃ

আমার কথা আমি তাঁকেই বলব। তাঁর সঙ্গেই আমি দেখা করতে চাই।

ঃ বেশ তাই হবে।

—এই বলে লোকটি বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ বাদেই ছাত্রটির ডাক পড়লো বাড়ির ভেতরে। ছেলেটি ঘরে ঢুকে দেখে হাঁটুর ওপর কাপড়-পরা সেই লোকটিই হাসিমুখে ঘরের মধ্যে সোফায় গা এলিয়ে বসে আছেন।

ছাত্রটির তখন বুঝতে বাকি রইলো না যে উনিই আশুতোষ। লজ্জায় তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠলো। কিভাবে সে আশুতোষের কাছে ক্ষমা চাইবে তা ভেবে না পেয়ে দিশাহারা হয়ে পড়লো। শেষে নতজানু হয়ে সে আশুতোষের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে উদ্যত হলো।

আশুতোষ তখনই তার হাত ধরে তুললেন। মিষ্টি কথায় আশ্বস্ত করলেন। তার কথা শুনে তার কাজ তো করে দিলেনই, উপরন্তু তাকে মিষ্টি খাইয়ে বিদায় দিলেন।

(খ) হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে আশুতোষের এক আত্মীয় ছিলেন। এই ভদ্রলোক অত্যন্ত বাতিকগ্রস্ত ছিলেন। হাওয়া আর জলকে উনি যমের মত ভয় করিতেন। ভদ্রলোক বিশ বছর স্নান করেন নি। আর পাছে কান দিয়ে হাওয়া ঢুকে পড়ে সেই ভয়ে কানে সর্বদা তুলো গুঁজে রাখতেন। ঘর-পোড়া গরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়, হীরালালবাবু তেমনি আকাশে একটুখানি বাদলার মেঘ দেখলে ভীত হতেন।

মধুপুর।

ডিসেম্বরের এক প্রচণ্ড শীতের দিন।

আশুতোষের পাশে বসে আছেন হীরালালবাবু। যথারীতি কানে তাঁর তুলো গোঁজা, আর গায়ে আষ্টেপৃষ্ঠে গরম জামা জড়ানো।

আশুতোষ হীরালালবাবুর দিকে না তাকিয়েই গম্ভীর গলায় চাকরকে ডেকে বল্লেন ঃ

ওরে, এক বালতি ঠাণ্ডা জল নিয়ে আয় দিকি।

চাকর তক্ষুণি জল নিয়ে এলো।

আশুতোষ চাকরকে কি একটা ইশারা করলেন। আর অমনি চাকর সেই এক বালতি ঠাণ্ডা জল হীরালালবাবুর মাথা ঢেকে দিলো।

আর যায় কোথা!

দু'হাত ওপর দিকে তুলে হীরালালবাবু অদ্ভুত দেহভঙ্গী করতে

লাগলেন। আর দূরে বসে আশুতোষ সেই অঙ্গভঙ্গী প্রশান্ত ভাবে উপভোগ করতে লাগলেন।
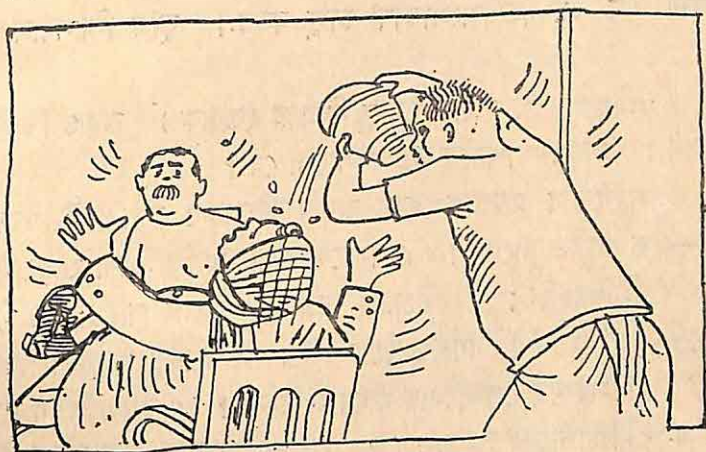
হীরালালবাবু শীতে কাবু

আশুতোষের মত গম্ভীর প্রকৃতির লোকও যে কেমন রসিক ছিলেন—এই ঘটনা দুটিই তার সাক্ষ্য দেয়।

২। **নীরব-কর্মী আশুতোষ ঃ**

অধ্যাপক ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন প্রায়ই আশুতোষের কাছে যেতেন ঃ স্যার, এম. এ.-তে বাংলা পরীক্ষা নেওয়ার একটা ব্যবস্থা করুন।

যখন দীনেশবাবু এ অনুরোধ করতেন তখনই আশুতোষ তাঁর বিরাট গোঁফ জোড়া ফুলিয়ে গর্জন করে বলে উঠতেন ঃ

তোমার বাংলা আবার একটা ভাষা! আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন শ্রেণীতে আবার পড়তে হবে! শোন কথা।

এই তর্জন-গর্জনে দীনেশবাবু হকচকিয়ে যেতেন। কারণ তাঁর ধারণা ছিল যে আশুবাবু বাংলা ভাষার পক্ষে আছেন। কিন্তু ঐ তর্জন-গর্জন শুনে দীনেশবাবু ধারণা পাল্টাচ্ছিল ; তবে তিনি একেবারে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন নি। সুযোগ পেলেই মেজাজ বুঝে আশুতোষের কাছে কথাটা পাড়তেন। এমনি ভাবে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল।

হঠাৎ একদিন উপাচার্য আশুতোষের কক্ষে দীনেশবাবুর ডাক পড়লো। আশুতোষ সেদিন হাসতে হাসতে বল্লেন : দীনেশবাবু, এইবার এম. এ. তে বাংলাভাষা চালু করব। তুমি সিলেবাস তৈরি কর।

এইকথা শুনে দীনেশবাবু বিস্ময়ে হতবাক। তবুও তিনি প্রশ্ন করলেন : হঠাৎ আপনার মত বদলালো যে ?

আশুতোষ একগাল হেসে জবাব দিলেন : ঢাল নেই, তরোয়াল নেই—যুদ্ধ করতে যাবেন। তোমাকে দিয়ে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' লিখিয়েছি ; লিখিয়েছি 'বঙ্গ সাহিত্যের পরিচয়' ও 'বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাস'। দাশগুপ্তকে দিয়ে লিখিয়েছি 'সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা'। এ সব বই লেখানোর মানে জান না ? এ বইগুলি না থাকলে এম. এ. পরীক্ষার্থীদের কি পড়াব ? তোমরা যতক্ষণ সোরগোল করেছ, আমি তখন জমি তৈরি করেছি।

৩। কর্মচঞ্চল আশুতোষ :

আশুতোষ নিজে ছিলেন কর্মচঞ্চল ব্যক্তি আর তাঁর বাড়ীও ছিল কর্মের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

প্রতিদিন কম করে ৪০।৫০ জন লোক তাঁর সঙ্গে নানান্ কাজে দেখা করতে আসতেন। এঁদের বসানো হতো বৈঠকখানা ঘরে। দর্শন-প্রার্থীদের মধ্যে ধনী-নির্ধন, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান, উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী, রাজা-মহারাজা, ছাত্র, কানা, খোঁড়া, বেকার—সব রকমের লোকই থাকতেন।

আশুতোষের সঙ্গে দেখা করতে হলে কোন কার্ড লাগতো না বা পরিচয়-পত্র সঙ্গে করে আনতে হতো না। তোমরা হয়তো ভাবছ যে—এই ভিড় তিনি সামলাতেন কি করে। তাই না ?

উনি কি করতেন শোন :

প্রত্যেককে একে একে ডেকে সংক্ষেপে তাঁদের বক্তব্য বলতে অনুরোধ করতেন। দু-মিনিট কথা বল্লেই আসল কথাটি তিনি বুঝতে

পারতেন। তারপর একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে লোকটিকে বিদায় দিতেন। একটিও বাজে কথা বলতেন না বা বাজে কথা শুনতে চাইতেন না। আর অসাধারণ স্মৃতি-শক্তি থাকায় প্রত্যেকের কথাই মনে রাখতেন। যাঁকে যা করব বলতেন—ঠিক সময় তা করতেন। আশুতোষকে কোনদিন বলতে শোনা যায় নি ঃ মশাই, ভুলে গেছি; আর একদিন আসবেন।

৪। ছাত্রবন্ধু আশুতোষ ঃ

(ক) একবার এক অধ্যাপকের ওপর ম্যাট্রিক পরীক্ষার অঙ্কের প্রশ্ন করবার ভার পড়েছিল। তখনকার দিনে নিয়ম ছিল—প্রশ্ন করে তা উপাচার্যকে দেখাতে হবে। উপাচার্যের অনুমোদন পেলে তবে তা ছাপা হবে। এই অধ্যাপক তাই একদিন প্রশ্নপত্রটি আশুতোষকে দেখাতে এসেছিলেন।

সেদিন রবিবার।

অধ্যাপক মশাই যখন এলেন তখন বেলা ১১টা হবে। আশুবাবু তখন তেল মাখছেন স্নানে যাবেন বলে। সেই অবস্থাতেই অধ্যাপক মশাইয়ের হাত থেকে প্রশ্নপত্রটি তিনি চেয়ে নিলেন। তারপর মিনিট দুই-তিন প্রশ্নের ওপর চোখ বুলিয়ে অধ্যাপক মশাইকে সেটি ফেরৎ দিয়ে বল্লেন ঃ

আপনাকে একটু খাটিয়ে নেব। আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কি ?

অধ্যাপক ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।

আশুতোষ ঃ আপনি কয়েক ঘণ্টা এখানে থাকতে পারবেন ?

অধ্যাপক ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।

আশুতোষ তখন চাকরকে দিয়ে ঘর থেকে কিছু কাগজ, কলম, কালি, ব্লটিং পেপার ইত্যাদি আনালেন। তারপর অধ্যাপক মশাইকে বল্লেন ঃ আপনি দয়া করে এই প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন। আমি স্নান-খাওয়া সেরে আসছি।

অধ্যাপক মশাই তখন ছাত্রের মত মুখ গুঁজে নিজেরই করা প্রশ্নের উত্তর লিখতে বসলেন।

আড়াই ঘণ্টা বাদে আশুতোষ ফিরে এলেন। এসেই অধ্যাপক মশাইকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনার উত্তর লেখা শেষ হলো ?

অধ্যাপক ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, এই মাত্র শেষ হলো।

এই বলে তিনি উত্তর-পত্রটি আশুবাবুর হাতে তুলে দিলেন। আশুতোষ খাতার দিকে না তাকিয়েই বল্লেন ঃ

দেখুন, প্রশ্ন করার সময় কতকগুলি কথা মনে রাখবেন। প্রথমতঃ প্রশ্নপত্র পেয়ে পরীক্ষার্থীরা তা ভাল ভাবে পড়ে বুঝবে। সেজন্য মিনিট পনের সময় দরকার। উত্তর লেখার পর আর একবার উত্তর-পত্রটি পড়ে দেখবে। ভুলচুক থাকলে তা সংশোধন করবে। এ জন্যেও মিনিট পনের সময় দরকার। দু-বার পনের মিনিট করে আধ ঘণ্টা সময় বাদ দিলে বাকি থাকে আড়াই ঘণ্টা। সেই সময়ের মধ্যে যাতে সব প্রশ্নের উত্তর লেখা যায়—এমন ভাবে প্রশ্নপত্র তৈরি করা উচিত।

আপনি অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত। আপনার মত লোকেরই যদি এ প্রশ্নের উত্তর লিখতে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে তবে পরীক্ষার্থীরা কি করে ঐ সময়ের মধ্যে উত্তর লিখবে ? তাদের ভাববার ও পড়ে দেখবার সময় দিলেন কই ? প্রশ্ন হাতে পেয়েই আপনার মত ঘস ঘস করে কি তারা লিখে যেতে পারবে ?

যাক্ আপনাকে কষ্ট দিলাম। কিছু মনে করবেন না। আমার কথা তো বুঝলেন। এখন সেই অনুযায়ী প্রশ্নপত্রটি সংশোধন করে দেবেন।

অধ্যাপক মশাই সেদিন এক নতুন শিক্ষা পেলেন।

(খ) কলকাতার গোলদীঘির পাড়।

ফুল বাগানের পাশে একটি ছেলে বসে কাঁদছে। এক যুবক

যাচ্ছিলেন ঐ পথে; ছেলেটির কান্নায় যুবক বিচলিত হলেন। তিনি ছেলেটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: কি হয়েছে ভাই তোমার? কাঁদছ কেন তুমি?

ছেলেটি বল্লে: সংসারে আমার বৃদ্ধা মা ছাড়া আর কেউ নেই। আমি গ্রামের হাইস্কুলে বিনা বেতনে পড়ি। গ্রামের জমিদার মশাই বলেছিলেন আমি ম্যাট্রিক পাশ করতে পারলে তিনি আমাকে একটা চাকরি দেবেন।

যুবক: বেশ তো। সে তো ভাল কথাই।

বালক: এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছিলাম। কিন্তু আমার কপাল খারাপ। বাংলা পরীক্ষার দিন কাঁপুনি দিয়ে ভীষণ জ্বর এলো। জ্বরে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। পরীক্ষা দেওয়া আর হলো না। এখন পাশ তো করতে পারবই না উপরন্তু আমাদের না খেয়ে মরতে হবে। জমিদারবাবু তো আর পাশ না করলে চাকরি দেবেন না।

সব শুনে যুবক খানিকক্ষণ কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বল্লেন:

দেখ, সার আশুতোষ আমার পরিচিত। তাঁর কাছে আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি। একমাত্র তিনিই তোমার সমস্যা সমাধানের কোন উপায় বাত্‌লে দিতে পারেন। যাবে তুমি তাঁর কাছে?

রাজি হলো ছেলেটি।

যুবক তাকে সঙ্গে করে আশুতোষের কাছে নিয়ে যান। বালক আশুতোষের পায়ে পড়ে কাঁদতে থাকে।

আশুতোষ তখন যুবকটিকে বল্লেন: তোমরা কি আমাকে সর্বশক্তিমান মনে করছ? যে ছেলে একটি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারে নি, তাকে আমি পাশ করাই কি ভাবে? তুমিই বল কি করতে পারি আমি? বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কানুনগুলো মানতে হবে তো?

যুবক: এর একটা উপায় আপনাকে করতেই হবে। কিছু

করবার থাকলে তা আপনার দ্বারাই হবে। সেই আশাতেই ছেলেটিকে আপনার কাছে এনেছি।

গম্ভীরভাবে আশুতোষ মিনিট খানেক কি যেন ভাবলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর মুখ যেন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বল্লেন ঃ একটা উপায় আছে। এই বলে ছেলেটির পিঠে হাত রেখে বল্লেন ঃ

আই. এ. পরীক্ষা এখনও হয় নি। আই. এ.'র বাংলা পরীক্ষা দিতে পারবে ?

ছেলেটি সোৎসাহে বল্লে ঃ অবশ্যই পারব।

আশুতোষ ঃ তবেই এখনই এই মর্মে আমার কাছে একখানি দরখাস্ত লিখে দিয়ে যাও। আর দেখ—বেশ মন দিয়ে পরীক্ষা দিও কিন্তু। ঘাবড়াবার কিছু নেই। আই. এ.'র বাংলায় তো বই থেকে প্রশ্ন থাকে না। সবই বাইরের প্রশ্ন—সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন। কাজেই মন দিয়ে পরীক্ষা দাও। পাশের জন্য ভাবতে হবে না।

আশুতোষের পরামর্শ হত ছেলেটি আই. এ.'র বাংলা পরীক্ষা দিল। পাশও করলো তাতে। যে উচ্চতর পরীক্ষার এক বিষয়ে পাশ করেছে তার পক্ষে নিম্নতর পরীক্ষার সেই বিষয়ে পাশের কোন বাধাই থাকতে পারে না—এই যুক্তিতে ছেলেটিকে সেবার ম্যাট্রিক পাশ করানো হলো।

৫। বিনয়ী আশুতোষ ঃ

আশুতোষ তখন বিচারপতির পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। একটা জটিল মামলায় পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে কলকাতা থেকে ঘন ঘন পাটনায় যাতায়াত করছেন। কানা-ঘুঁষা শোনা গেল—উনি নাকি এবার কলকাতা ছেড়ে পাটনাতেই বসবাস করবেন।

এই কথা শুনে তাঁর গুণমুগ্ধ অনুগামীদের একজন একদিন তাঁকে বল্লেন ঃ

শুনলাম আপনি নাকি কলকাতার বাস ছাড়ছেন ?

আপনি কলকাতা ছেড়ে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় যে একদিনও চলবে না।

এই কথা শুনে আশুতোষ বল্লেন ঃ আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করে যাব। তাই বলে ভাববেন না যে আশু মুখুজ্জ্যে ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় অচল হবে। বিশ্ব-বিদ্যালয় আশু মুখুজ্জ্যের চেয়ে ঢের বড়। আশু মুখুজ্জ্যে একদিন মরে যাবে কিন্তু টিঁকে থাকবে এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে কতো বঙ্কিম, কতো হেমচন্দ্র, কতো নবীন সেন, কতো জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্ল রায় কালে আবির্ভূত হবেন। তাঁরাই বাঁচিয়ে রাখবেন এ বিশ্ববিদ্যালয়কে। আশু মুখুজ্জ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচিয়ে রেখেছেন বা রাখবেন—এ ধারণা গ্লানিকর।

আশুতোষ যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন সে কথা কে না জানে। তবুও তাঁর এ উক্তি তাঁর বিনয়ের পরিচায়ক।

৬। সময়নিষ্ঠ আশুতোষ ঃ

আশুতোষ সব কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করতেন। 'কাল করব' বলে কোন কাজ ফেলে রাখতেন না। কোথাও কোন সভা-সমিতিতে যাবার কথা থাকলে নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগেই যেতেন। আর ট্রেণ ধরতে হলে তো কথাই নেই। ট্রেনের সময়ের অনেক আগেই স্টেশনে গিয়ে হাজির হতেন।

তোমরা হয়তো ভাবছ—অত আগে স্টেশনে গিয়ে অযথা বসে থাকার দরকার কি ? শোন তবে—

আশুতোষ তখন ছোট। কাকা রাধিকাপ্রসাদের সঙ্গে কলকাতার বাইরে যেতে হবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। স্টেশনে যাওয়ার জন্যে দরজার গোড়ায় টম্‌টম্ গাড়ী অপেক্ষা করছে। বালক আশুতোষ যাবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। রওনা হবার জন্যে কাকাকে ক্রমাগত তাগাদা দিচ্চেন।

ভাইপোর তাগাদায় বিরক্ত হয়ে রাধিকাপ্রসাদ বল্লেন ঃ দেখ্

আশু, আমার টম্‌টমের ঘোড়া খুব তেজী। স্টেশনে যেতে বিশ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না। টিকিট কাটতে সময় লাগবে দু-মিনিট। আর দু'এক মিনিট হাতে রাখতে হবে। তাহলে ট্রেণ ছাড়ার পঁচিশ মিনিট আগে রওনা হলেই চলবে। এক ঘণ্টা আগে থাকতে স্টেশনে গিয়ে লাভ কি!

গুরুজনের মুখের ওপর কথা বলা চলে না। কাকার ইচ্ছা অনুযায়ীই কাজ হলো। ওঁরা ট্রেন ছাড়বার পঁচিশ মিনিট আগেই রওনা হলেন। কিন্তু হঠাৎ পথের মাঝে গাড়ীর রাস গেল ছিঁড়ে। মেরামত করে নিয়ে রওনা হতে দশ মিনিট দেরী হলো। যখন ওঁরা স্টেশনে পৌঁছুলেন তখন ট্রেনখানা হুস-হুস শব্দে স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ওঁরা হাঁ করে ট্রেনখানার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

রাধিকাপ্রসাদ ঠেকে শিখলেন। আশুতোষেরও শিক্ষা হলো। এরপর ট্রেন ধরার দরকার হলে যথেষ্ট সময় হাতে রেখেই আশুতোষ স্টেশনে যেতেন।

৭। মাতৃভক্ত আশুতোষঃ

(ক) দেব-দেবীকে আমরা যেমন ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি—আশুতোষ তাঁর মাকে ঠিক তেমনি ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। এখন যে ঘটনা দু'টি উল্লেখ করব, তার থেকেই সে পরিচয় তোমরা পাবে।

ভারতের বড়লাট তখন লর্ড কার্জন। আর আশুতোষ তখন হাইকোর্টের উকিল। লর্ড কার্জনের ইচ্ছা হলো আশুতোষকে তিনি বিলাত পাঠাবেন। ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনে যে সব মনীষীর সৃষ্টি হয়েছে, বিলাতের জনসাধারণকে তার একটা উজ্জ্বল উদাহরণ দেখাবেন। এই আশা নিয়ে তিনি আশুতোষকে তাঁর অভিপ্রায়ের কথা জানালেন। ভাবলেন এ কথা শুনে আশুবাবু বোধহয় খুবই আনন্দিত হবেন।

কিন্তু বড়লাটের চিঠির উত্তরে আশুতোষ কি লিখলেন জান? লিখলেনঃ

আমার মা আমাকে সমুদ্রপারে যেতে দেবেন না ; কাজেই আপনার অভিপ্রায় অনুসারে বিলাত যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হবে না।

বড়লাটের আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো। তিনি আশুতোষকে ফের লিখলেন ঃ

আশুবাবু, আপনার মাকে বলবেন যে অনুরোধ স্বয়ং লর্ড কার্জনের—ভারতের সর্বোচ্চ রাজপ্রতিনিধির। আপনাকে বিলাত যেতেই হবে—এ আমার আদেশ।

জ্বালাময়ী ভাষায় আশুতোষ এ চিঠির জবাব দিলেন। লিখলেন ঃ

ভারতের বড়লাট বা তাঁর চেয়েও উচ্চতর এমন কেউ নেই যিনি আমার বা আমার মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্তৃত্ব করতে পারেন। আমাকে আদেশ দেওয়ার অধিকার আছে একমাত্র আমার মায়ের। পৃথিবীর সম্রাটের চেয়েও আমার কাছে তিনি বড়। তাঁর আদেশ না পেলে ভারত সম্রাটের আদেশও আমার কাছে অকিঞ্চিৎকর।

এ চিঠি পেয়ে লর্ড কার্জন স্তম্ভিত হলেন। আর সেই সঙ্গে মুগ্ধ হলেন আশুতোষের মাতৃভক্তির পরিচয় পেয়ে।

(খ) ১৯০৪ সালের কথা।

ভারতের বড়লাট, আশুতোষকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের প্রস্তাব জানিয়ে চিঠি দিলেন।

আশুতোষ কিন্তু তখনই সে পদ গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। বল্লেন ঃ

আগে আমার মায়ের অনুমতি দরকার। তাঁর অনুমতি ভিন্ন স্বর্গের সিংহাসনও আমি গ্রহণ করতে পারব না—জজের পদ তো দূরের কথা !

জজিয়তির নিয়োগপত্র হাতে নিয়ে আশুতোষ তাঁর মায়ের সম্মুখে হাজির হলেন। বড়লাট তাঁকে বিচারপতির পদে নিয়োগ করার

ইচ্ছা প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছেন—তাও জানালেন। তা শুনে জগত্তারিণী দেবী বল্লেন ঃ

দেখ্ বাবা, জজের কাজে যে কি গৌরব, তা আমি বুঝি না। যতবড় পদই হোক না কেন—তা তো চাকরিই। চাকরিতে আবার গৌরব কি !

আশুতোষ ঃ দেখুন মা, বাবা আমাকে বলেছিলেন যদি তোকে চাকরি নিতে হয় তো জজিয়তির নীচে কোন কাজ নিস্ নে। তাছাড়া আপনি তো জানেন যে ছেলেবেলা থেকেই জজ হবার জন্যে বাবা কত রকম ভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন। যাই হোক্ এখন আপনার যা ইচ্ছা, তাই হবে।

ছেলের কাছে এই সব কথা শুনে মা আপাততঃ মত দিলেন। মায়ের মত পেয়ে আশুতোষ তখনই ঐ পদ গ্রহণ করতে রাজি হয়ে বড়লাটকে চিঠি দিলেন।

এদিকে আর এক কাণ্ড হয়েছে।

সারারাত জগত্তারিণী দেবীর ঘুম হয়নি। সারারাত তিনি ছেলের চাকরির কথা ভেবেছেন। ভোর না হতেই ছেলের কাছে ছুটে গিয়ে বল্লেন ঃ

আশু, আমার সিদ্ধান্ত স্থির করেছি। এ চাকরি তোর নেওয়া চলবে না।

আশুতোষ ঃ সে কি মা ! আমি যে এই পদ গ্রহণ করব বলে সিমলায় বড়লাটের কাছে চিঠি পাঠিয়েছি।

মা ঃ সে চিঠি প্রত্যাহার করে এখনই সিমলায় তার করে দে। চিঠি সিমলায় পেঁাছুবার আগেই তার সেখানে পেঁাছে যাবে।

আশুতোষ ঃ মা, এমন কাজ করলে যে আমার মুখ থাকবে না। এ কাজ যে বড়ই অশোভন হবে।

ছেলের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে দিলেন না জগত্তারিণী দেবী। এবার তিনি খুশী মনেই ছেলেকে চাকরি নিতে সম্মতি দিলেন।

৮। নির্ভীক আশুতোষ ঃ

গভীর রাত।

আলিগড় থেকে কলকাতাগামী একখানি ট্রেণ আঁধারের বুক চিরে হুস হুস শব্দে ছুটে চলেছে। সেই ট্রেনের একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আশুতোষ ছিলেন একলা। নিদ্রাজড়িত চোখে ঝিমোচ্ছিলেন।

একটি স্টেশনে গাড়ী থামলো। এক ইংরেজ মিলিটারী অফিসার সেই কামরায় উঠলেন। তাঁর সঙ্গে সামান্য কিছু মালপত্র। সাহেব ভেবেছিলেন—কামরাটি হয়তো সম্পূর্ণ খালি পাবেন। একাই গোটা কামরাটি দখল করে সুখে রাত কাটাবেন। তার বদলে এক কালা আদমীকে কামরায় দেখে সাহেব বিরক্ত হলেন। আরও বিরক্ত হলেন সেই কালা আদমীর বেশভূষা দেখে। হাঁটুর ওপর তোলা ধুতি, পায়ে নাগরা জুতো, গায়ে গলাবন্ধ কোট। মুখে কিছু না বললেও হাবভাবে সাহেব তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন। আর আশুতোষ তা লক্ষ্য করছিলেন। আশুতোষের দিকে না তাকিয়ে সাহেব কিছুক্ষণ জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন।

ট্রেণ হুস হুস শব্দে ছুটে চলেছে। ঝাঁকুনিতে আশুতোষের ঘুম এসেছে। আর সাহেবের মাথায় জেগেছে তখন কুবুদ্ধি। তিনি আশুতোষকে জব্দ করার জন্যে এক ফন্দি এঁটেছেন। আশুতোষের নাগরা জুতোর এক পাটি তিনি লাথি মেরে গাড়ীর বাইরে ফেলে দিলেন। তারপর নিজের গায়ের কোটটি খুলে কামরার দেওয়ালে আঁটা একটি আংটায় ঝুলিয়ে রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমোলেন।

ট্রেন চলতে লাগলো। স্টেশনের পর স্টেশন পেরিয়ে চললো। একটা স্টেশনে গাড়ী থামতেই আশুতোষের ঘুম গেল ভেঙে। উঠে দেখেন—এক পাটি জুতো নেই। বুঝতে বাকি রইলো না যে এ কাজ ঐ সাহেবেরই। মনে মনে আশুতোষ সাহেবকে উচিত শিক্ষা দেবার সংকল্প করলেন। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধিও এলো। কামরার দেওয়ালের আংটায় ঝুলছিল সাহেবের কোট। আশুতোষের নজর পড়লো সে

দিকে। উনি কালবিলম্ব না করে ঐ কোটটিকে তুলে কামরার জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন। সাহেব তখন ঘুমে অচেতন।
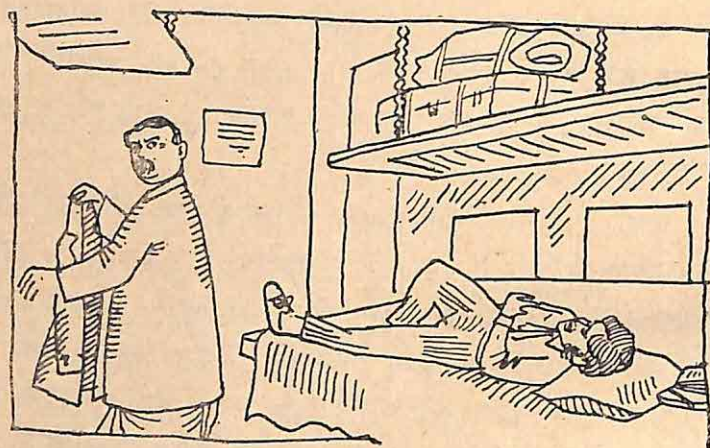
শঠে শাঠ্যং

ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই সাহেব তাঁর কোটের সন্ধান করলেন কিন্তু সেটিকে খুঁজে না পেয়ে খুব রেগে গেলেন। কর্কশ কণ্ঠে সাহেব আশুতোষকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমার কোট কোথায় ?

গম্ভীর স্বরে আশুতোষ জবাব দিলেন ঃ তোমার কোট আমার এক পাটি জুতোকে খুঁজতে গিয়াছে।

জবাব শুনে সাহেব তো হতভম্ব ! তিনি তখন তাঁর মিলিটারী মেজাজ দেখিয়ে আশুতোষকে শাসিয়ে উঠলেন। আশুতোষ ভয় পাবার মানুষ নন্। বলিষ্ঠ দেহখানি নিয়ে তিনি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

কালা-আদমীর সেই পুরুষসিংহের মত বিরাট চেহারা দেখে সাহেবের মিলিটারী মেজাজ ক্ষণিকের মধ্যেই ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তিনি চুপ করে গেলেন।

৯। পোষাকপ্রিয় আশুতোষ ঃ

ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের জন্যে ভারত সরকার একটি কমিশন গঠন করেন। লীড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার মাইকেল

স্যাডলারের নেতৃত্বে এই কমিশন গঠিত হয়। তাই এর নাম স্যাডলার কমিশন। আশুতোষ এই কমিশনের অন্যতম সদস্য মনোনীত হন।

স্যাডলার কমিশনের সদস্য হিসাবে আশুতোষকে একবার মহীশূর রাজ্যে যেতে হয়। মহীশূররাজ কমিশনের সকল সদস্যকে তাঁর প্রাসাদে ভোজের নিমন্ত্রণ জানান। নির্দিষ্ট দিনে রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী গাড়ী নিয়ে আসেন আশুতোষকে নিয়ে যাবার জন্যে। ধুতি-চাদর পরে আশুতোষ বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হন।

আশুতোষের ঐ পোষাক দেখে মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী অবাক হলেন। অবাক হলেন এই ভেবে যে—অতবড় একজন শিক্ষিত ব্যক্তি রাজদরবারের আদব-কায়দা জানেন না!

তিনি আশুতোষকে বল্লেন ঃ

রাজদরবারের রীতি অনুসারে আপনাকে চাপকান পরে মাথায় পাগড়ি বেঁধে যেতে হবে। দয়া করে আপনি আপনার পোষাক বদলে আসুন। আর আপনার অমন পোষাক না থাকলে বলুন আমি আনিয়ে দিচ্ছি।

এই কথার কি জবাব আশুতোষ দিলেন জান? বল্লেন ঃ

আমি বাঙালী। ধুতি-চাদর আমার জাতীয় পোষাক। এই পোষাক ছাড়া অন্য কোন পোষাক আমি পরি না। আপনাদের দরবারের খাতিরে আমি তো আমার জাতীয় পোষাক ছাড়তে পারি না। কাজেই মহারাজকে বলবেন—আমি তাঁর দরবারে যেতে অক্ষম।

যথাসময়ে মহীশূররাজ দরবারে এলেন। দেখলেন স্যাডলার কমিশনের প্রায় সকলেই উপস্থিত। অনুপস্থিত শুধু স্যার আশুতোষ। প্রাইভেট সেক্রেটারীকে মহারাজ আশুতোষের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন প্রাইভেট সেক্রেটারী সব কথা খুলে বল্লেন।

মহারাজা তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে তিরস্কার করে বল্লেন ঃ

আপনি এখনই যান। আশুবাবুকে বলুন—যে পোষাকে খুশী সেই পোষাকেই তিনি দরবারে আসতে পারেন।

রাজকর্মচারী তখনই আবার গাড়ী নিয়ে ছুটলেন। আশুতোষকে মহারাজের বক্তব্য নিবেদন করলেন। আশুতোষ তখন ধুতি-চাদর পরে হাসতে হাসতে রাজদরবারে এলেন।

রাজকর্মচারী ক্ষমা চাইলেন। মহীশূররাজ দুঃখ প্রকাশ করলেন। সব মিটমাট হয়ে গেল।

১০। গুণজ্ঞ আশুতোষ :

বড়লোকেরা সাধারণতঃ তর্ক বা কথা কাটাকাটি পছন্দ করেন না। আশুতোষ কিন্তু ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তর্কের দ্বারা, যুক্তির দ্বারা, তাঁকে কেউ কিছু বোঝালে তিনি খুশীই হতেন। তিনি নিজে ছিলেন পুরুষসিংহ। তাই সিংহ-বিক্রম পুরুষদেরই তিনি ভালবাসতেন। মিহি গলায়, মিনমিনে স্বরে, তোষামুদি চালে কাকুতি-মিনতি বড় অপছন্দ করতেন তিনি।

একবার কয়েকটি ছাত্র দল বেঁধে তাদের অভাব-অভিযোগের কথা জানাবার জন্যে আশুতোষের কাছে এলো। তাদের মধ্যে একটি ছেলে সুদর্শন আর সুবক্তা। সে যুক্তির সাহায্যে প্রায় আধ ঘণ্টা আশুতোষের সঙ্গে তর্ক করলো। গুণজ্ঞ আশুতোষ ছেলেটির যুক্তিপূর্ণ তর্কে খুব খুশী হলেন। আর খুশী মনেই তাদের প্রার্থনা পূরণ করবার আশ্বাস দিলেন।

১১। সাদাসিধে আশুতোষ :

আশুতোষ অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন। তিনি কঠিন শয্যা পছন্দ করতেন। শয্যার চেয়েও কঠিন বালিশে মাথা রেখে তিনি আরামে ঘুমুতেন। স্যাডলার কমিশনের সদস্যরূপে আশুতোষকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরতে হতো। অনেক ধনী ও সম্মানিত ব্যক্তির গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করতে হতো। কিন্তু কখনই তিনি গদি-আঁটা বিছানায় শুতেন না।

একদিন এক ধনীর গৃহে আশুতোষ আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। আশুতোষ কিন্তু সে বিছানায় শোন্ নি। মাটিতে চাদর পেতে

অপেক্ষাকৃত একটি কঠিন বালিশ মাথায় দিয়ে ঘুমিয়েছিলেন। 'আর গৃহস্বামী সে কথা জানতে পেরে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

জীবন-সায়াহ্নে আশুতোষ

মদ খাওয়া তো দূরের কথা, সিগারেট এমন কি পান পর্যন্ত আশুতোষ কোনদিন খাননি। একবার এক বিয়েতে আশুতোষের নিমন্ত্রণ ছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর গৃহস্বামী আশুতোষকে একটি

পান খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিলেন। আশুতোষ সেদিন হেসে বলেছিলেন ঃ আমরা তিনপুরুষ ও জিনিসটি স্পর্শ করিনি। আমাদের পারিবারিক সংস্কার ত্যাগ করবার জন্যে বৃথা অনুরোধ করবেন না।

একখানি অতি সাধারণ ধুতি এবং একটি খাটো কোট পরে আশুতোষ ভারতের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতেন। এমন কি হাইকোর্টে দিনের কাজ শেষ করে কোর্টের পোষাক ছেড়ে ধুতি পরতেন। তারপর বিশাল কাঁধের ওপর অবহেলার সঙ্গে চাদর ঝুলিয়ে হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতিদের জন্যে নির্দিষ্ট সিঁড়ি বেয়ে জোরে-জোরে নেমে আসতেন।

বাড়িতে উনি সাধারণতঃ খাটো ধুতি পরে খালি গায়ে চটি পায়ে ঘুরে বেড়াতেন।

একদিন এক হ্যাট-কোট পরা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি আশুতোষের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন। আশুতোষ তখন ঐ বেশে বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। আশুতোষকে দেখে সাহেব ভাবলেন—ইনি বোধহয় এ বাড়ির কোন কর্মচারী। এই ভেবে ওঁর হাতে একখানি কার্ড দিয়ে বল্লেন ঃ

জজ্ সাহেবকে এই কার্ডখানি দেখাবেন। আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

আশুতোষ কার্ডখানি ডান হাতে নিয়ে বাঁ হাতে রাখলেন। কোন কথা না বলেই করমর্দনের জন্যে নিজের ডান হাতখানি সাহেবের দিকে একটুখানি এগিয়ে দিলেন। তিনি যতই হাত বাড়াতে থাকেন সাহেব ততই পিছোতে থাকেন। তাই না দেখে আশুবাবু হেসে বল্লেন ঃ ভয় পাচ্ছেন কেন সাহেব, আমিই আশু মুখুজ্জ্যে। হাইকোর্টের জজ।

সাহেব তো অবাক ! হাইকোর্টের জজের এই বেশ !

আশুতোষের জীবন-পঞ্জী

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ ... জন্ম।

১৮৭৫ " ... সাউথ সুবার্বন স্কুলে প্রবেশ।

১৮৭৯ " ... এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ।

১৮৮১ " ... এফ. এ. পরীক্ষা পাশ।

১৮৮৪ " ... বি. এ. পাশ।

১৮৮৫ " ... প্রথমবার এম. এ. পাশ; রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য।

১৮৮৬ " ... দ্বিতীয়বার এম. এ. পাশ; প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ; এডিনবরা রয়্যাল সোসাইটির ফেলো। লণ্ডন ফিজিক্যাল সোসাইটির সভ্য।

১৮৮৭ " ... বি. এল. পাশ ও ওকালতি আরম্ভ;

১৮৮৮ " ... প্যারিসের গণিত সোসাইটির সদস্য।

১৮৮৯ " ... কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সিণ্ডিকেটের সদস্য।

১৮৯০ " ... সিসিলির গণিত সোসাইটির সদস্য; প্যারিসের ফিজিক্যাল সোসাইটির সদস্য।

১৮৯৩ " ... অনার্স-ইন্-ল।

১৮৯৪ " ... ডক্টর-অভ-ল।

১৮৯৮ " ... ঠাকুর আইন অধ্যাপক।

১৮৯৯ " ... বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য।

১৯০৪ " ... কলকাতা হাইকোর্টের জজ।

১৯০৬-১৯১৪ " ... চারবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

১৯১৭ " ... স্যাডলার কমিশনের সদস্য।

১৯২০ " ... অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি।

১৯২১-১৯২৩ " ... পঞ্চমবার উপাচার্য।

১৯২৩ " ... হাইকোর্ট থেকে অবসর গ্রহণ।

১৯২৪ " ... ইহলোক ত্যাগ।

"কবে এমন দিন আসিবে, যখন আমার শিক্ষিত দেশবাসিগণ আচারে-ব্যবহারে, কথায়-বার্তায়, চাল-চলনে প্রকৃত বাঙালীর মতন হইবে। কবে দেখিব, দেশের যাঁহারা মুখপাত্র-স্বরূপ, সমাজের যাঁহারা নেতা, বঙ্গভাষা তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা। কবে শুনিব—শিক্ষিত বাঙালী আর এখন বাঙলা ভাষায় সর্বসমক্ষে কথা বলিতে বা প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতে সঙ্কোচবোধ করেন না, বা বঙ্গবাসী নিজেকে বঙ্গভাষার সেবকরূপে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না।"

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়